ফেলুদা সমগ্র

রবার্টসনের রুবি

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. মামা- ভাগনে 2
২. ইংরিজিতে বলে কোইন্সিডেন্স আর বাংলায় কাকতালীয় 8
৩. লালমোহনবাবুর বন্ধু শতদল সেন 14
৪. ফিসফিসিয়ে কথা 23
৫. রাধাবিনোদের টেরা কোটা মন্দির 32
৬. ঘরে বসে আড্ডা মারছি. 39
৭. ষোড়শোপচারে ডিনার. 49
৮. ব্যথাটা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি. 58
৯. এক আশ্চর্য ঘটনা 65

১. মামা-ভাগনে

মামা-ভাগনে বলতে আপনার বিশেষ কিছু মনে পড়ে? প্রশ্নটা জটায়ুকে করল ফেলুদা।

আমি অবিশ্যি উত্তরটা জানতাম, কিন্তু লালমোহনবাবু কী বলেন সেটা জানার জন্য তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিলাম।

আঙ্কল অ্যান্ড নেফিউ? চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

নো স্যার। ইংরেজি করলে চলবে না। মামা-ভাগনে। বলুন তো দেখি কীসের কথা মনে পড়ে।

দাঁড়ান মশাই, আপনার এই দুম করে করা প্রশ্নগুলো বড় গোলমেলে। মামা ভাগনে...মামা ভাগনে...। উঁহু। আমি হাল ছাড়লুম, এবার আপনি আলোকপাত করুন।

অভিযান ছবিটা দেখেছেন?

সে তো বহুকাল আগে!–ও ইয়েস!–লালমোহনবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। সেই পাথর। একটা বিরাট চ্যাপটা চাইয়ের উপর আরেকটা বিরাট পাথর ব্যালান্স করা রয়েছে নাকের ডগায়। মনে হয় হাত দিয়ে ঠেলা মারলেই উপরের পাথরটা দুলবে। মামার পিঠে ভাগনে–তাই তো?

রাইট। ব্যাপারটা কোথায় সেটা মনে পড়ছে?

কোন জেলা বলুন তো!

বীরভূম।

ঠিক ঠিক।

অথচ ও অঞ্চলটায় একবারও ঢুঁ মারা হয়নি। আপনি গেছেন?

টু টেল ইউ দ্য টুথ-নো স্যার।

ভাবুন তো দেখি! -আপনি লেখক, তা যেরকম লেখাই লিখুন না কেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছেন, সেইখানেই যাননি। কী লজ্জার কথা বলুন তো দেখি!

যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি মশাই। আর সত্যি বলতে কী, আমরা তো ট্যাগোরের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্ত ধরিচি কিনা, তাই শান্তিনিকেতন-টেন্তনকে তেমন আর পাত্তা দিইনি। হনলুলুতে হুলুস্থূল যে লিখছে সে আর কবিগুরু থেকে কী প্রেরণা পেতে পারে বলুন!

আপনি বীরভূম বলতে আশা করি শুধু শান্তিনিকেতন ভাবছেন না। বক্রেশ্বরের হট স্প্রিংস আছে, কেন্দুলিতে কবি জয়দেবের জন্মস্থান আছে, বামাক্ষ্যাপা যেখানে সাধনা করতেন। সেই তারাপীঠ আছে, মামা-ভাগনের দুবরাজপুর আছে, অজস্র পোড়া ইটের মন্দির আছে–

সেটা আবার কী দেখবার জিনিস মশাই?

টেরা কোটা জানেন না? বাংলার এক বড় সম্পদ!

ট্যাড়া কোঠা? মানে, ব্যাক বাড়ি?

কেউ কোনও বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে ফেলুদার স্কুলমাস্টার মূর্তিটা বেরিয়ে পড়ে। ও বলল–

টেরা-টি হুঁ আর আর এ-ল্যাটিন ও ইটালিয়ান কথা, মানে মাটি; আর কোটা-সি ও ডবল টি এ–এও ইটালিয়ান কথা, মানে পোড়া। মাটি আর বালি মিশিয়ে তা দিয়ে নানারকম মূর্তি ইত্যাদি গড়ে উনুনের আঁচে রেখে দিলে যে লাল চেহারাটা নেয়। তাকে বলে টেরা

কোটা। যেমন সাধারণ ইট। যেটা বানানো হয় সেটা যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয়, টেকসইও বটে। এই টেরা কোটার মন্দির ছড়িয়ে আছে। সারা পশ্চিম বাংলায় আর বাংলাদেশে। তার মধ্যে সেরা মন্দির কিছু পাওয়া যাবে বীরভূমে। তার কোনও কোনওটা আড়াইশো-তিনশো বছরের পুরনো। কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়। বাংলার এ সম্পদ সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহাল নয়। সে বাংলার কিছুই জানে না।

বুঝলাম। জানলাম। আমার ঘাট হয়েছে। কাইন্ডলি এক্সকিউজ মাই ইগনোরান্স।

আপনি জানেন না, অথচ একজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক এই নিয়ে যা কাজ করে গেছেন তার তুলনা নেই।

কার কথা বলছেন?

ডেভিড ম্যাককাচন। অকাল মৃত্যু তাঁর কাজ শেষ করতে দেয়নি, কিন্তু তাও যা করেছেন তার জবাব নেই। আপনি খবরের কাগজের হেডলাইন ছাড়া আর কিছু পড়েন না জানি– তাই আজ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা অনুমান করতে পারি। না হলে ডেভিড ম্যাককাচনের উল্লেখ সেখানে পেতেন।

কী লেখা বলুন তো।

রবার্টসনস রুবি।

রাইট, রাইট। লেখার নামটা দেখে আর রুবির রঙিন ছবিটা দেখে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু ধোপা এসে সব মাটি করে দিল।

প্রবন্ধের লেখক পিটার রবার্টসন এখন এখানে। ভারতপ্রেমিক বলে মনে হল। ম্যাককাচনের লেখা পড়ে বীরভূমের মন্দির দেখতে চায়, তা ছাড়া ট্যাগোরের শান্তিনিকেতন দেখতে চায়।

কিন্তু রুবির ব্যাপারটা কীভাবে আসছে?

এই পিটারের এক পূর্বপুরুষ প্যাট্রিক রবার্টসন সিপাইদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয় এবং ব্রিটিশদের জয় হয়, প্যাট্রিক তখন লখ্নৌতে। মোটে ছাব্বিশ বছর বয়স। ইংরেজ সেনা ছলেবলে নবাবের প্রাসাদে লুটতরাজ করে এবং মহামূল্য মণিমুক্তা নিয়ে পালায়। প্যাট্রিক রবার্টসন একটি রুবি পান যার আয়তন একটা পায়রার ডিমের সমান। সেই রুবি প্যাট্রিকের সঙ্গে ইংল্যান্ডে আসে এবং প্যাট্রিকের মৃত্যুর পর রবার্টসন পরিবারেই থেকে যায়। লোকে উল্লেখ করত। রবার্টসনস রুবি বলে। সম্প্রতি প্যাট্রিকের একটি শেষ বয়সের ডায়রি পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না। তাতে প্যাট্রিক লখ্নৌয়ের লুটতরাজের উল্লেখ করে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। প্যাট্রিক বলেছেন তাঁর আত্মা শান্তি পাবে শুধুমাত্র যদি তাঁর কোনও বংশধর ভারতবর্ষ থেকে লুট করে আনা এই রুবি আবার ভারতবর্ষে ফেরত দিয়ে দেয়। পিটার সেই পাথর সঙ্গে করে এনেছে, এবং যাবার আগে এখানে কোনও মিউজিয়ামে দিয়ে যাবে।

লালমোহনবাবু পুরো ব্যাপারটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কেন্দুলিতে শীতকালে দারুণ মেলা হয় বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন। দলে দলে বাউল আসে। সেই মেলাতে।

সেটা ঠিক কখন হয় মশাই?

এই এখন। মকর সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছে।

হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো?

লালমোহনবাবুর মাঝে মাঝে একটা সাহেবি মেজাজ প্রকাশ পায়। উনি বলেন সেটা ওঁর গল্প লেখার জন্য অনেক ইংরেজি বই কনসাল্ট করতে হয় বলে।

ফেলুদা বলল, সত্যিই যেতে চাইছেন বীরভূম?

ভেরি ম্যাচ সো।

তা হলে আমি বলি কী, আপনি হরিপদবাবুকে বলুন সোজা আপনার গাড়ি নিয়ে বোলপুর চলে যেতে। আমরা সেদিনই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাব। যাবার আগে অবশ্য টুরিস্ট লজে বুকিং করে নিতে হবে। ফাস্ট ট্রেন; শুধু বর্ধমানে থামে; আড়াই ঘণ্টায় শান্তিনিকেতন পৌঁছে যাব।

ট্রেনেই যাব বলছেন?

তার কারণ আছে। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে লাউঞ্জ করে বলে একটা ফাস্ট ক্লাস এয়ারকন্ডিশনড় বগি থাকে। এতে করিডর নেই, সেই আদ্যিকালের কামরার মতো চওড়া। পঁচিশ ত্রিশজন যায়, বৈঠকখানার মতো সোফা কাউচ টেবিল পাতা রয়েছে। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

জিহ্বা দিয়ে লালাক্ষরণ হচ্ছে মশাই। তা হলে একটা কাজ করি। –শতদলকে একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দিই।

শতদলটা কে?

শতদল সেন। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়িচি, এখন বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল মশাই, আমি ওকে কোনওদিন টেক্কা দিতে পারিনি।

তার মানে আপনিও ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন বলছেন?

তা বাংলার জনপ্রিয়তম থ্রিলার রাইটার সম্বন্ধে সেটা কি বিশ্বাস করা খুব কঠিন ব্যাপার?

–তা আপনার বর্তমান আই কিউ-৫ পর্যন্ত বলে ফেলুদা আর কথাটা শেষ করল না। বলল, লিখে দিন আপনার বন্ধুকে।

দুদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বোলপুর টুরিস্ট লজে একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুম বুক করা হয়েছে। গরম কাপড় বেশ ভালরকম নিতে হবে, কারণ এটা জানুয়ারি মাস, শান্তিনিকেতনে কলকাতার চেয়ে বেশি শীত। ইতিমধ্যে আমি ডেভিড ম্যাককাচনের বইটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। দেখে অবাক লাগছিল যে একজন লোক কী করে এত জায়গায় ঘুরে এত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছে। বাংলার এই আশ্চর্য সম্পদ সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না।

শনিবার সকালে লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডর নিয়ে হরিপদবাবু বেরিয়ে পড়লেন। পানাগড় অবধি গিয়ে ডাইনে ঘুরতে হবে, তারপর অজয় নদী পেরিয়ে ইলামবাজার দিয়ে বোলপুর।

আমরা সাড়ে নটায় হাওড়া স্টেশনে জড়ো হলাম। লালমোহনবাবু বললেন, আমার দুদিন থেকে ডান চোখটা নাচছে; সেটা গুড সাইন না ব্যাড সাইন, মশাই?

ফেলুদা বলল, আপনি খুব ভাল করেই জানেন আমি ও ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, তাও কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো!

লালমোহনবাবু কেমন যেন মুষড়ে পড়ে বললেন, একবার ভাবলুম এটা হয়তো কোনও আসন্ন তদন্তের লক্ষণ; তারপর মনে হল ট্যাগোরের সঙ্গে ক্রাইমের কোনও রকম সম্পর্ক থাকা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই ওটা আপনি মন থেকে দূর করে দিতে পারেন, ফেলুবাবু।

২. ইংরিজিতে বলে কোইন্সিডেন্স আর বাংলায় কাকতালীয়

লালমোহনবাবু অবশ্য পরে বললেন, ওটাই হচ্ছে, ওঁর ডান চোখ নাচার কারণ, আমার কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা যাকে ইংরিজিতে বলে কোইন্সিডেন্স আর বাংলায় কাকতালীয়।

লাউঞ্জ করে সবসুদ্ধ চব্বিশ জন বসতে পারে, কিন্তু উঠে দেখি আমাদের নিয়ে রয়েছে মাত্র দশ জন; তার মধ্যে আবার দুজন সাহেব। একজনের সোনালি চুল, দাড়িগোঁফ নেই, আরেকজনের কালো চাপ দাড়ি আর কাঁধ অবধি লম্বা চুল। বয়স ফেলুদার চেয়ে কিছু কমই হবে-মানে ত্রিশের সামান্য বেশি। আমার মন কিন্তু বলল এর মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পিটার রবার্টসন।

সেটা যে সত্যি সেটা জানা গেল গাড়ি ছাড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই।

একটা সোফায় আমরা তিনজন পাশাপাশি বসেছি, সত্যিই বুঝতে পারছি এরকম আরামের কামরা এর আগে কখনও দেখিনি। ফেলুদা একটা চারমিনার বার করে মুখে পুরে লাইটারটা দিয়ে সেটা ধরিয়েছে এমন সময় সোনালি চুল-ওয়ালা সাহেব মুখে একটা সিগারেট পুরে ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, মে আই-?

ফেলুদা লাইটারটা সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, আর ইউ গোইং টু বোলপুর টু?

সাহেব সিগারেটটা ধরিয়ে লাইটারটা ফেরত দিয়ে হাসিমুখে ফেলুদার দিকে হ্যান্ডশোকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, ইয়েস। মই নেম ইজ পিটার রবার্টসন, অ্যান্ড দিস ইজ মই ফ্রেন্ড টম ম্যাক্সওয়েল।

ফেলুদা এবার আমাদের তিনজনেরই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, তোমার লেখাই তো সেদিন স্টেটসম্যানে পড়ছিলাম না?

ইয়েস। ডিড ইউ লাইক ইট?

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেখা। সেই রুবি কি তুমি কাউকে দিয়ে দিয়েছ?

না। ওটা আমাদের সঙ্গেই আছে। আমরা কলকাতার মিউজিয়ামকে ওটা অফার করেছি। ঘটনাটা কিউরেটরকে জানিয়েছি। উনি বলেছেন। উনি অত্যন্ত খুশি হবেন পাথরটা মিউজিয়ামের জন্য পেলে। উনি অবশ্য ব্যাপারটা দিল্লিতে জানিয়েছেন। ওখান থেকে অনুমতি পেলেই আমরা পাথরটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিউজিয়মের হাতে তুলে দেব। কিউরেটর বললেন ভারতবর্ষের অনেক সম্পাদই নাকি বিদেশে চলে গেছে, তার সামান্য অংশও যদি এইভাবে ফেরত পাওয়া যেত তা হলে কত ভাল হত।

তোমার তো ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়েছে; তোমার বন্ধুরাও আছে নাকি?

উত্তরটা বন্ধু নিজেই দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন পিটার রবার্‌টসন।

টমের ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন বীরভূমে এক নীলকুঠির মালিক। জামানরা কৃত্রিম উপায়ে নীল বার করে সস্তায় বাজারে ছাড়ার পর ভারতবর্ষ থেকে নীলের চাষ উঠে যায়। তখন টমের পূর্বপুরুষ রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল দেশে ফিরে যান। আমাদের দুজনেরই একই ভ্রমণের নেশা আর তার থেকে বন্ধুত্ব। টম একজন পেশাদার ফোটাগ্রাফার। আমি ইস্কুল মাস্টারি করি।

টমের পাশেই কামরার মেঝেতে রাখা একটা ব্যাগ দেখে আন্দাজ করেছি। তাতে ক্যামেরার সরঞ্জাম রয়েছে।

তোমরা ক’ দিন বীরভূমে থাকবে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

দিন সাতেক, বলল। পিটার রবার্টসন। আসল কাজ কলকাতাতেই, কিন্তু বাংলার কিছু টেরা কোটা মন্দির দেখার শখ আছে।

বীরভূমে অবিশ্যি মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু দেখবার জিনিস আছে! একবার গিয়ে পড়লে একসঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে। ভাল কথা-তোমার স্টেটসম্যানের লেখার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি?

কী, বলছ! -লেখা বার হবার তিনদিনের মধ্যে স্টেটসম্যানে চিঠি আসতে শুরু করে। লেখকদের মধ্যে রাজারাজড়ার ম্যানেজার আছে, ধনী ব্যবসাদার আছে, রত্ন সংগ্রাহক আছে। এরা সকলেই রুবিটা কিনতে চায়। আমি আমার লেখার মধ্যে স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে ওটা আমি বিক্রি করব না। রবার্টসনের রুবি নিয়ে আমাদের দেশেও রত্ন সংগ্রাহকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে অনেকদিন থেকে। তারা ওটার জন্য কত টাকা দিতে প্রস্তুত তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমি লন্ডনে যাচাই করিয়ে দেখেছি, এটার মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস।

পাথরটা বোধহয় তোমার কাছেই রয়েছে?

ওটা টমের জিন্মায়। এ ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবধান। তা ছাড়া ওর রিভলভার আছে, প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করতে পারে।

পাথরটা কি একবার দেখা যায়?

নিশ্চয়ই।

পিটার টমের দিকে দৃষ্টি দিল। টুম তার ক্যামেরার ব্যাগ খুলে তার মধ্যে থেকে একটা নীল মখমলের বাক্স বার করল। ফেলুদা তার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে খুলতেই আমাদের তিনজনের মুখ দিয়ে একসঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। শুধু যে এমন পাথর এর আগে দেখিনি তা নয়-এমন লাল রংও আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

ফেলুদা পাথরটা কিছুক্ষণ হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ইটস্ অ্যামেজিং! বলে সেটা ফেরত দিয়ে দিল। তারপর টম ম্যাক্সওয়েলকে উদ্দেশ করে বলল, আপনার রিভলভারটা একবার দেখতে পারি? ও বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে।

কথাটা বলে ফেলুদা তার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে পিটারের হাতে দিল।

পিটারের চোখ কপালে উঠে গেল।

সে কী-তুমি যে দেখছি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? তা হলে তো আমাদের কোনও গণ্ডগোল হলে তোমার শরণাপন্ন হতে হবে।

গণ্ডগোল আশা করি হবে না, যদিও সেটা নির্ভর করছে ম্যাক্সওয়েল সাহেবের উপর, কারণ পাথরটা ওঁর জিন্মায় রয়েছে।

ইতিমধ্যে ম্যাক্সওয়েল তার রিভলভারটা বার করেছে, এবার সেটা ফেলুদাকে দেখতে দিল। দেখেই বুঝলাম সেটা ফেলুদার কোল্ট না, অন্য কোম্পানির তৈরি।

ওয়েরলি স্কট, বলল ফেলুদা। তারপর রিভলভারটা ফেরত দিয়ে বলল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিশ্চয়ই।

তোমার এটার দরকার হয় কেন?

ফোটাগ্রাফির নেশা আমাকে নানান জায়গায় নিয়ে যায়। অনেক দুর্গম জায়গায় আমি গিয়েছি, জংলি উপজাতিদের ছবি তুলেছি। বুঝতেই পারছি সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই রিভলভার দিয়ে আমি অ্যাফ্রিকায় ব্ল্যাক মাম্বা সাপ পর্যন্ত মেরেছি।

ভারতবর্ষে এর আগে কখনও এসেছ?

না, এই প্রথম।

ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছ?

কলকাতার কিছু জনবহুল অঞ্চলের ছবি তুলেছি।

তার মানে বস্তি?

হ্যাঁ। আমি যেই পরিবেশে মানুষ সেরকম পরিবেশের ছবি তোলার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। তার থেকে যত অন্যরকম হয় ততই ভাল; আমার মনে হয়, পভার্টি ইজ মোর ফোটোজেনিক দ্যান প্রসপেরিটি।

ফোটো-হোয়াট? প্রশ্নটা করলেন জটায়ু।

ফোটাজেনিক, বলল ফেলুদা। অর্থাৎ চিত্রগুণসম্পন্ন।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বাংলায় মন্তব্য করলেন, এ, কি বলতে চায় হাড়হাভাতেরা আর মোর. ফোটোজেনিক দ্যান যারা খেয়ে-পরে আছে?

ম্যাক্সওয়েল বলল, কাজেই এখানেও আমাদের ওই কথাটা মনে রাখতে হবে? ওই কথা মনে রেখেই আমি এখানেও ছবি তুলব।

ভদ্রলোকের কথাগুলো আমার কেন জানি অদ্ভুত লাগছিল। পিটার ভারতবর্ষকে ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বন্ধুর মনোভাব এত অন্যরকম হয় কী করে? এই বন্ধুত্ব টিকবে তো?

বর্ধমানে চা-ওয়ালা ডেকে ভাঁড়ে চা খাওয়া হল, সেই চা-ওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে তার ছবি তুললেন ম্যাক্সওয়েল। ।

বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল রিকশার ভিড় দেখে ম্যাক্সওয়েল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পিটার তাকে জানিয়ে দিল যে স্টেশনে এত সময় নষ্ট করা চলবে না।

চারটে রিকশা নিয়ে মালপত্তর সমেত আমরা যখন বোলপুর টুরিস্ট লজে পৌঁছলাম তখন একটা বেজে দশ মিনিট।

৩. লালমোহনবাবুর বন্ধু শতদল সেন

স্টেশনে লালমোহনবাবুর বন্ধু শতদল সেন এসেছিলেন। লালমোহনবাবুরই বয়সী, ফরসা রং, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল। অনেকদিন পরে একজনকে দেখলাম যিনি লালমোহনবাবুকে লালু বলে সম্বোধন করলেন। ভদ্রলোক নিজেও অবিশ্যি হয়ে গেলেন সতু।

যে যার ঘরে যাবার আগে টুরিস্ট লজের লাউঞ্জে বসে কথা হচ্ছিল। শতদলবাবু বললেন, তোদের গাড়ি বলছিস তিনটে নাগাত আসবে। তারপর তোরা চলে আসিস আমার ওখানে। পিয়ার্সন পল্লীতে খোঁজ করলেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। নাম শান্তিনিলয়। তোদের একবার উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সটা দেখিয়ে আনব।

ফেলুদা বলল, আমাদের সঙ্গে কি দুজন সাহেব যেতে পারেন?

বেশ তো-তারাও ওয়েলকাম।

শতদলবাবু চলে গেলেন।

সকালে স্নান করে বেরিয়েছিলাম, তাই ঘরে মালপত্তর রেখে প্রথমেই লাঞ্চটা সেরে নিলাম। শান্তিনিকেতনে সত্যিই শান্ত পরিবেশ, তাই ফেলুদার রেস্ট হবে ভাল; ও সম্প্রতি দুটো মামলা করে এসেছে। প্রথমটা মনে হয়েছিল আত্মহত্যা, কিন্তু শেষটায় দাঁড়াল খুন, আর দ্বিতীয়টা জালিয়াতি। দুটোই বেশ ঝামেলার কেস ছিল, তাই ওরা এখন সত্যিই বিশ্রামের দরকার।

ডাইনিং রুমেই পিটার আর টমকে আমাদের বিকেলের প্ল্যানটা বলে দিলাম। পিটার তৎক্ষণাৎ রাজি, যদিও টম কিছুই বলল না। পিটার এও বলল যে এর মধ্যেই ও দুবরাজপুরের এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছে। ফোনটা করেছিল

তাঁর ছেলে, কারণ ভদ্রলোকের ইংরিজিটা নাকি তেমন সড়গড় নয়। পিটার বলল, ভদ্রলোক আমার রুবির খবরটা পেয়েছেন এবং সেটা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি অবিশ্যি বলতে বাধ্য হলাম যে আমি ওটা বেচব না। তাতে ভদ্রলোক ছেলেকে দিয়ে বললেন যে পাথরটা তাঁর একবার দেখার ইচ্ছে। আশা করি সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করব না।

ভদ্রলোকের নাম কী?

জি. এল. ড্যানড্যানিয়া।

ঢানঢানিয়া। বুঝলাম। কখন অ্যাপিয়েন্টমেন্ট?

কাল সকাল দশটা।

আমরা আসতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। আপনারা এলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব। ইন ফ্যাক্ট, আপনারা ভাল দোভাষীর কাজ করতে পারবেন। দুবরাজপুর আর তার পাশেই হেতমপুরে তো ভাল টেরা কোটার মন্দির আছে বলে ম্যাককাচন লিখেছে। কথা সেরে না হয় সেগুলো দেখে আসব।

শুধু মন্দির না, ফেলুদা বলল, দুবরাজপুরে আরও দেখার জিনিস আছে। হাতে সময় থাকলে সেও দেখা যেতে পারে।

হরিপদবাবু অ্যাম্বাসডর নিয়ে পৌনে চারটেয় এসে পৌঁছালেন। পথে বর্ধমানে খেয়ে নিয়েছিলেন, বললেন আমরা বেরোতে চাইলে বেরোতে পারি। –আমার বিশ্রামের কোনও দরকার নেই, স্যার।

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। পিয়ার্সন পল্লী থেকে শতদল সেনকে তুলে নিয়ে ছজনে গিয়ে হাজির হলাম। উত্তরায়ণে। পিটার এরকম বাড়ি এর আগে দেখেনি, বলল, ইট লুকাস লাইক এ ফেয়ারি টেল প্যালেস।

উদীচী, শ্যামলীও দেখা হল। কোনওখানেই পভার্টির ছাপ নেই বলেই বোধহয় ম্যাক্সওয়েল তার ক্যামেরা বারই করল না।

লালমোহনবাবু সব দেখেটেখে বললেন, নো স্যার, এই অ্যাটমোসফিয়ারে এখন প্রখর রুদ্রর প্লষ্ট বেরোবে না; তার জন্য চাই ক্যালকাটার পরিবেশ।

ফেরবার পথে পিটার আর টম একটা সাইকেল রিকশা ধরল। পিটার বলল, কাছেই একটা ট্রাইব্যাল ভিলেজ আছে, টম তার কিছু ছবি তুলতে চায়।

বুঝলাম সাঁওতাল গ্রামের কথা বলা হচ্ছে।

সাহেবদের বিদায় দিয়ে আমরা আমাদের ঘরে এসে অন্ত্যাক্ষরী খেলে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। যাবার সময় শতদলবাবু তাঁর থলি থেকে একটা বই বার করে জটায়ুকে দিয়ে বললেন, এই নিন—লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম, লেখক এক পাদ্রি, নাম রেভারেন্ড প্রিচার্ড। একশো বছর আগের লেখা বই। ইন্টারেস্টিং তথ্যে বোঝাই। পড়ে দেখবেন।

উনি না পড়লেও আমি নিশ্চয়ই পড়ব। বলল ফেলুদা।

পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সারা হল। দুবরাজপুর এখান থেকে ২৫ কিলোমিটার, যেতে আধা ঘণ্টার বেশি লাগবে না। ঢানচানিয়ার ছেলে ওদের বাড়িটা কোথায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল, আর তা ছাড়া এও বলেছিল যে দুবরাজপুরে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাড়ি।

আমরা দশটার পাঁচ মিনিট আগেই একটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাড়ির লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম, গেটের গায়ে ফলকে লেখা জি. এল. ঢানগনিয়া।

সশস্ত্র দারোয়ান একবার আমাদের মুখটা দেখে নিয়েই গেট খুলে দিতে বুঝলাম যে তাকে বলা হয়েছে সাহেবরা আসছে।

গেট খুলে দিতে গাড়ি ঢুকে খানিকটা মোরামফেলা পথ দিয়ে গিয়েই সদর দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম। দরজার সামনে একটা স্কুটার ধরে একজন বছর পাঁচিশের ছেলে, সে আমাদের দেখেই স্কুটারটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে এল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। পিটার এগিয়ে গেল যুবকের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলল, মই নেম ইজ পিটার রবার্টসন। ইউ মাস্ট বি কিশোরীলাল?

হ্যাঁ। আমি কিশোরীলাল ঢানঢানিয়া। আমার বাবা আপনাদের সঙ্গে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করেছেন। চলুন, আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

আমার এই তিনজন ভারতীয় বন্ধুও যেতে পারেন তো?

নিশ্চয়ই।

আমরা কিশোরীলালকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাতলায় উঠে দুটো ঘর আর একটা বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জুতো খুলতে হবে কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না না, কোনও দরকার নেই! কিশোরীলালের বাংলায় বেশ একটা টান আছে।

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দরজা জানালায় রঙিন কাচ, তাই দিয়ে আলো এসে ঘরটাকে বেশ রংদার করে তুলেছে। ঘরের অর্ধেকটা ফরাস পাতা, বাকি অংশটায় সোফা চেয়ার ইত্যাদি রয়েছে।

মালিক বসে আছেন ফরাসের এক প্রান্তে, শীর্ণকায় চেহারায় একটা প্রকাণ্ড তাগড়াই গোঁফ। একটা অদ্ভুত বৈপুরীত্য এনেছে। চারপাশে তাকিয়া ছড়ানো। মালিক ছাড়াও ঘরে রয়েছেন বছর পঞ্চাশেকের একটি ভদ্রলোক, পরনে ছাই রঙের প্যান্টের সঙ্গে খয়েরি রঙের জ্যাকেট। ইনি আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

পিটার ঢানঢানিয়াকে উদ্দেশ করে ভারতীয় ভঙ্গিতে একটা নমস্কার করে বলল, মিঃ ড্যানড্যানিয়া, আই প্রিজিউম।

ইয়েস, বললেন ঢানঢানিয়া, অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ইনস্পেক্টর চৌবে।

ইনি আমার বন্ধু টম ম্যাক্সওয়েল, আর এঁরা তিনজনও আমার বন্ধুস্থানীয়।

ফেলুদা বলল, আমার নাম প্রদোষ মিত্র, ইনি মিঃ গাঙ্গুলী, আর এ আমার ভাই তপেশ।

সিট ডাউন, বৈঠিয়ে। –কিশোরী, রামভজনকে বোলো মিঠাই আর সরবতকে লিয়ে।

কিশোরীলাল আজ্ঞা পালন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা চেয়ার আর সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম। এবারে লক্ষ করলাম দেয়ালে চতুর্দিকে টাঙানো দেবদেবীর ছবি। মগনলাল মেঘরাজের বেনারসের বৈঠকখানার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

আমরা বসতে ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল, আমাদের তো কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না, আমরা এসেছি মিঃ রবার্টসনের সঙ্গে। আপনার কোনও আপত্তি থাকলে কিন্তু আমরা এখুনি চলে যেতে পারি।

নো, নো। স্রেফ একটা পাথর দেখার ব্যাপার, আপনারা থাকলে ক্ষেতি কী?

ম্যাক্সওয়েল হঠাৎ বলে উঠল, মে আই টেক সাম পিকচার্স, মিঃ ড্যানড্যানিয়া!

হোয়াট পিকচার্স।

অফ দিস রুম।

ঠিক হ্যায়।

হি সেজ ইউ মে, বলে দিল ফেলুদা।

লেকিন পাহলে তো উয়ো রুবি দেখলাইয়ে।

হি ওয়ন্টস টু সি দ্য রুবি ফাস্ট, বলল ফেলুদা।

আই সি

ম্যাক্সওয়েল ক্যামেরাটা পাশে সরিয়ে রেখে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রুবির কোটাটা বার করল। তারপর সেটাকে খুলে ঢানঢানিয়ার দিকে এগিয়ে দিতে আমার বুকটা কেন জানি ধুকপুক করে উঠল।

ঢানঢানিয়া পাথরটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কোনও মন্তব্য না করে সেটা তাঁর বন্ধু ইন্সপেক্টর চৌবের হাতে চালান দিলেন। চৌবে সেটা খুব তারিফের দৃষ্টিতে দেখে আবার ঢগনঢানিয়াকে ফেরত দিল।

হোয়াট প্রাইস ইন ইংল্যান্ড? ঢানঢানিয়া প্রশ্ন করলেন।

টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস, বলল। পিটার রবার্টসন।

হুম–দশ লাখ রূপয়া...

এবার পাথরটা বাক্সে রেখে সেটা ম্যাক্সওয়েলকে ফেরত দিয়ে ঢানঢানিয়া বললেন, আই উইল পে টেন ল্যাখস।

লাখ ব্যাপারটা সাহেবরা বাঝে না বলে আবার ফেলুদাকে বলে দিতে হল, হি মিনস ওয়ান মিলিয়ান রুপিজ।

কিন্তু তার প্রশ্ন আসছে কী করে, বলল রবার্টসন, আমি তো পাথরটা বিক্রি করব না।

এই প্রথম বুঝলাম ঢানঢানিয়া ইংরেজিটা দিব্যি বাঝেন, কেবল বলার সময় হোঁচট খান।

হোয়াই নট? শুধোলেন ঢানঢানিয়া।

আমার পূর্বপুরুষের সাধ ছিল এটা ভারতবর্ষে ফেরত যাক, বলল রবার্টসন, আমি তাঁর সে সাধ পূরণ করতে এসেছি। আমি এ পাথর নিয়ে ব্যবসা করব না। এটা আমি কলকাতার মিউজিয়মে দিয়ে দেব।

দ্যাট ইজ ফুলিশ, বললেন ঢানটানিয়া। জাদুঘরে এই পাথর আলমারির এক কোণে পড়ে থাকবে। লোকে ভুলেই যাবে ওটার কথা।

সে তো আপনাকে বিক্রি করলে আপনি ওটা বাক্স-বন্দি করে রেখে দেবেন।

ননসেন্স! বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন ঢানঢানিয়া। আমি আমার নিজের মিউজিয়ম করব–যেমন সালার জং মিউজিয়ম আছে হায়দ্রাবাদে। সেই রকম মিউজিয়ম আমি করব, দুবরাজপুরে নয়, কলকাতায়। গণেশ ঢানঢানিয়া মিউজিয়ম। লোকে এসে আমার কালেকশন দেখে যাবে; ইওর রুবি উইল বি ইন এ স্পেশাল শো কেস। লোকে এসে দেখে তারিফ করবে। রুবির তলায় লেখা থাকবে সেটা কেথেকে কী ভাবে পাওয়া গেছে। তোমার নাম ভি থাকবে।

এবার দুজন ভৃত্যের প্রবেশ ঘটল। তাদের একজনের হাতে ট্রেতে লাড্ডু, আরেকজনের ট্রেতে সরবত।

লাড্ডু খান, খেয়ে ডিসাইড করুন। মিঃ রবার্টসন।

আমরা ডান হাতের কাজটা সেরে ফেলার জন্য তৈরি হলাম। লাঞ্চ টাইম হতে এখনও দেরি, কিন্তু পেট বলছে খেতে আপত্তি নেই। বীরভূমের জলের কথা আগেই শুনেছিলাম।

আমাদের সঙ্গে সাহেবরাও লাড্ডু খেল। তারপর সরবত খাবার সময় দেখি টম ম্যাক্সওয়েল পকেট থেকে একটি বড়ি বের করে তাতে ফেলে দিল।

মিঃ মিটার, বললেন গণেশ চানচানিয়া, আপনার বন্ধুদের বলে দিন কি বীরভূমের জল পিউরিফাই করার কোনও দরকার হয় না।

ফেলুদা অবিশ্যি সেটা আর বলল না।

ওয়েল? মিষ্টি খাবার পর গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন গণেশ ঢানাগনিয়া। ওক্স শীর্ণ শরীর থেকে এই হেঁড়ে গলা বার হওয়াটাও বেশ একটা অবাক করা ব্যাপার।

ভেরি সরি মিঃ ড্যানড্যানিয়া, বলল রবার্টসন, আমি তো বলেই ছিলাম। এ পাথর বিক্রির জন্য নয়। তুমি দেখতে চেয়েছিলে তাই দেখলাম।

এবার ইন্সপেক্টর চৌবে মুখ খুললেন।

আমি খালি একটা প্রশ্ন করতে চাই। পাথর বিক্রি করা না-করা আপনার মার্জি। কিন্তু এমন একটা জিনিস আপনার বন্ধু ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে আমার মোটেই ভাল লাগছে না! আপনি বললে আমি ওটার প্রোটেকশনের জন্য লোক দিতে পারি। সে হবে। প্লেন ক্লোদস ম্যান। আপনি তাকে পুলিশ বলে বুঝতেও পারবেন না, কিন্তু সে আপনাদের নিরাপত্তা এনশিওর করবে।

পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই, বলল। টম ম্যাক্সওয়েল। আমার কাছে এ পাথর সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় আছে। চার ছ্যাঁচড় এর ওপর দৃষ্টি দিলে তাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। আমি নিজেই অস্ত্রধারণ করি, পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই।

চৌবে হাল ছেড়ে দিলেন।

ঠিক আছে। আপনার যদি এতই কনফিডেন্স থাকে তা হলে আমার বলার কিছু নেই।

আপনারা ক'দিন আছেন? জিজ্ঞেস করলেন ঢানঢানিয়া।

চার পাঁচ দিন তো বটেই, বলল। পিটার রবার্টসন। আমি নিজে টেরা কোটা মন্দির সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড, এবং সেই নিয়ে কিছু পড়াশুনাও করেছি।

থিঙ্ক, মিঃ রবার্টসন, থিঙ্ক, বললেন ঢানঢানিয়া। থিঙ্ক ফর টুঁ ডেজ-দেন কাম টু মি আগেন।

বেশ তো। ভাবতে তো আর পয়সা লাগে না। ভেবে নিয়ে তারপর তোমাকে আবার জানাব।

গুড, বললেন ঢানসোনিয়া, অ্যান্ড গুড বাই।

৪. ফিসফিসিয়ে কথা

নাঃ-এ মশাই ভাবা যায় না?

গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললেন জটায়ু। উনি না বললে হয়তো আমি বলতাম, কারণ এরকম দৃশ্য আমি এর আগে কখনও দেখিনি। প্রায় এক বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ছাট বড় মাঝারি সাইজের পাথর কাত হয়ে পড়ে আছে না হয় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে যেগুলোর হাইট সত্যিই উঁচু সেগুলো প্রায় তিন তলা বাড়ির সমান। একেকটা বিশাল দাঁড়ানো পাথর আবার মাঝখান থেকে চিরে দুভাগ হয়ে গেছে। –হয়তো সুদূর অতীতের কোনও ভূমিকম্পের চিহ্ন। দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক ছাপ রয়েছে যে একটা পাথরের পাশ দিয়ে যদি একটা ডাইনোসর বেরিয়ে আসে তা হলেও অবাক হব না।

এইখানেই একটা বিশেষ জোড়া পাথরকে বলা হয় মামা-ভাগনে, আর তার থেকে পুরো জায়গাটারই নাম হয়ে গেছে মামা-ভাগনে।

গণেশ ঢান ঢানিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই ফেলুদা প্রস্তাব করল। দুবরাজপুরেই যখন আসা হয়েছে তখন মামা-ভাগনে না দেখে যাওয়ার কোনও মানে হয়। না। চৌবেও প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সাহেবরা এটার কথা আগে শোনেনি, এসে তাদের চোখ ছানাবাড়া হয়ে গেছে। পিটার খালি খালি বলছে ফ্যানট্যাস্টিক. ফ্যানট্যাস্টিক, আর টমের মুখে এই প্রথম হাসি দেখা দিয়েছে। সে একটা ছবি তোলার বিষয়ও পেয়ে গেছে-একটা উঁচু পাথরের মাথায় বসে একটা সাধু চিরুনি দিয়ে দাঁড়ি আঁচড়াচ্ছে। তিনি কী করে ওই টঙে চড়েছেন তা মা গঙ্গাই জানেন।

পিটার বলল, আচ্ছ, চারিদিকে ত্রিসীমানায় কোনও পাথর দেখছি না, অথচ এইখানে এত পাথর-এ নিয়ে কোনও কিংবদন্তি নেই?

ডু ইউ নো গড় হনুমান?

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিতভাবে করলেন জটায়ু। উত্তরে পিটার মৃদু হেসে বলল, আই হ্যাভ হার্ড অফ হিম।

এর পরে লালমোহনবাবু যা বললেন, একসঙ্গে এতটা নিতুল ইংরিজি বলতে তাঁকে এর আগে কখনও শুনিনি।

ওয়েল, হায়েন গড় হনুমান ওয়জ ফ্লাইং থ্রু দ্য এয়ার উইথ মাউন্ট গন্ধমাদন অন হিজ হেড, সাম রকস ফ্রম দি মাউনটেন ফেল হিয়ার ইন দুবরাজপুর।

ভেরি ইন্টারেস্টিং, বলল। পিটার রবার্টসন।

সাহেব থাকা সত্ত্বেও ফেলুদা জটায়ুকে উদ্দেশ করে বাংলায় বলল, হনুমানের কিংবদন্তিটা বোধহয় আপনার কল্পনাপ্রসূত?

নো স্যার! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু। লজের ম্যানেজার নিজে আমায় এটা বলেছেন। এখানে সবাই এটাই বিশ্বাস করে।

বাংলায় ভ্রমণ তা বলেনি।

কী বলেছে?

বলেছে রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধনের জন্য পাথর আনাইলেন, তখন কিছু পাথর পুষ্পক রথ থেকে এখানে পড়ে যায়।

ভালই, তবে নট অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই হনুমান।

ম্যাক্সওয়েলের মনে হল পাথরের ছবি তুলতে বিশেষ ভাল লাগছে না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল পাথরগুলো দারুণ ফোটাজেনিক। ওর সুযোগ এল মামা-ভাগনের এক প্রান্তে পাহাড়েশ্বর শিব আর শ্মশানকালীর মন্দিরে এসে।

মন্দিরে পুজো দেওয়া ও বোধহয় এই প্রথম দেখল, কারণ দেখলাম ওর ক্যামেরার খচখচ শব্দ আর থামছে না। এই শ্মশানকালীকেই নাকি রঘু ডাকাত পুজো দিত।

চৌবে দেখলাম ম্যাক্সওয়েলের কাণ্ড দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, এখানে অনেকেই কিন্তু বিদেশিরা যে সব কিছুর ছবি তুলে নিয়ে যায় সেটা পছন্দ করে না। এই ব্যাপারে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে।

কেন? ফোঁস করে বলে উঠল ম্যাক্সওয়েল। এখানে চোখের সামনে যা ঘটছে তারই তো ছবি তুলছি আমি, জোচ্চুরি তো করছি না।

তাও বলছি—কখন, কী নিয়ে কে আপত্তি করে বসে তা বলা যায় না। ভারতীয়রা এ ব্যাপারে একটু সেনসিটিভ। আমাদের কিছু আচার ব্যবহার বিদেশিদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেগুলোর ছবি তুলে বাইরে প্রচার করাটা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হতে পারে।

ম্যাক্সওয়েল তেড়ে মেড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পিটার তাকে একটা মৃদু ধমকে নিরস্ত করল।

আমরা মামা-ভাগনে দেখে তেষ্টা মেটানোর জন্য কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে রাস্তার উপরেই রাখা বেঞ্চিগুলোতে বসে চা আর নানখাটিই আড়ার দিলাম। হরিপদবাবু বললেন উনি এই ফাঁকে একবার চা খেয়ে নিয়েছেন তাই আর খবেন না?

ইন্সপেক্টর চৌবে ফেলুদার পাশে বসেছিলেন, তাঁর পাশে আমি। তাই চৌবে যে কথাটা বললেন সেটা আমার কানো এল।

আপনার নাম শুনেই আমি আপনাকে চিনেছি, কিন্তু সেটা আর প্রকাশ করিনি, কারণ মনে হল যত্রতত্র আপনার আসল পরিচয়টা প্রকাশ পেয়ে যায় সেটা হয়তো আপনি চাইবেন না।

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, বলল ফেলুদা।

এখানে কি বেড়াতে?

পুরোপুরি

আই সি।

আপনি তো বিহারের লোক বোধহয়।

হ্যাঁ, কিন্তু পাঁচপুরুষ ধরে আমরা বীরভূমেই রয়েছি। ভাল কথা, ম্যাক্সওয়েল ছেলেটির সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও যোগসূত্র আছে কি?

ম্যাক্সওয়েলের ঠাকুরদার ঠাকুরদাদা এই বীরভূমেই একটা নীলকুঠির মালিক ছিলেন। নাম বোধহয় রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল।

তাই হবে। আমি ছেলেবেলায় বাপ-ঠাকুরদাদার মুখে এক ম্যাক্সওয়েল সাহেবের নাম শুনেছি, তিনিও নীলকুঠির মালিক ছিলেন। লাভপুরের কাছে ছিল তাঁর কুঠি। গাঁয়ের লোকে বলত ম্যাকশেয়াল সাহেব। তারপর ক্রমে সেটা খাঁকিশেয়ালে পরিণত হয়।

কেন?

কারণ লোকটা ছিল ঘোর অত্যাচারী এবং অহংকারী। এর মধ্যেও দেখছি সেই পূর্বপুরুষের রক্ত কিছুটা বইছে। অথচ রবার্টসন সাহেব কিন্তু একবারেই সেরকম নন, সত্যি করেই ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের ভালবাসেন।

চা পর্ব সেরে দুবরাজপুরের দুমাইলের মধ্যে হেতমপুরে কয়েকটা সুন্দর টেরা কোটা মন্দির দেখে আমরা লাঞ্চের আগেই টুরিস্ট লজে ফিরে এলাম! হেতমপুরের মন্দিরের গায়ে দুশো বছরের পুরনো থামে মেমসাহেবের মূর্তি দেখে রবার্টসন মুগ্ধ। ম্যাক্সওয়েলের দেখলাম মন্দির সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই। সে রাস্তার ধারে টিউবওয়েলে এক মা তার বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল, তারই কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

হেতমপুর থেকে চৌবে বিদায় নেবার আগে ফেলুদা তাকে একটা প্রশ্ন করল।

আপনার সঙ্গে তো ঢানাগনিয়ার যথেষ্ট পরিচয় আছে দেখলাম। লোকটা কেমন?

চৌবে বলল, পরিচয় মানে ও আমাকে হাতে রাখতে চায়। ওর নানারকম সব ধোঁয়াটে কারবার আছে, তাই পুলিশের সঙ্গে ওর দোস্তি রাখাটা দরকার। আমি অবশ্য ওর খাতিরের মানে বুঝি এবং সব সময়ই চোখ কান খোলা রাখি। গোলমাল দেখলে আমি ওকে রেহাই দেব না। তবে লোকটা ধনী। ওই রুবির জন্য দশ লাখ দিতে ওর গায়ে লাগবে না।

ওঁর ছেলে কি ওর বাপের ব্যবসা দেখে?

কিশোরীলালের নিজের ইচ্ছা নেই বাপের ব্যবসায় থাকার। সে নিজে একটা কিছু করতে চায়, এবং সেই নিয়ে তার বাপের সঙ্গে কথাও হয়েছে। গণেশ তার ছেলেকে খুব ভালবাসে, তাই শেষ পর্যন্ত সে রাজিও হয়ে যেতে পারে।

আই সি।

ভাল কথা-আপনাদের কালকের প্ল্যান কী?

কাল ভাবছি সকালে একবার কেন্দুলির মেলাটা দেখে আসব।

আপনারা সবাই যাবেন? ইনকুডিং এই দুই সাহেব?

সেরকমই তো মনে হয়।

তা হলে আপনাকে বলে দিই-আপনি এই ম্যাক্সওয়েল ছাকরাটির উপর একটু দৃষ্টি রাখবেন। ওর ব্যবহার আমার মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

নিশ্চয়ই রাখব।

লজে ফিরে এসে আরও দুজনের সঙ্গে আলাপ হল—তাদের কথা এই বেলা লিখে রাখি।

এক–মিস্টার নস্কর। ইনি কলকাতার একজন নাম-করা ধনী ব্যবসায়ী। ইনি আগেই দুটোর সময় নিজের গাড়িতে এসে পৌঁছেছেন।

দুই–জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি বালপুরেই থাকেন। স্টেটসম্যানে পিটারের লেখাটা পড়ে সোজা আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করে বললেন উনি বীরভূম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। এখানকার প্রত্যেকটি টেরা কোটা মন্দির ওঁর দেখা এবং সে ব্যাপারে উনি সাহেবদের খুব সাহায্য করতে পারেন। পিটার তাঁকে বলে দিল ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

মিঃ নস্কর-পরে জেনেছিলাম পুরো নাম অর্ধেন্দু নস্কর-স্টুরিস্ট লজে এসে লাউঞ্জে আমাদের দেখা পেলেন। আমরা সবাই তখন লাঞ্চের ডাক কখন পড়বে তার অপেক্ষায় বসে আছি। ভদ্রলোক এসে ঢুকতে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কারণ চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো! টকটকে গায়ের রং, ফ্রেঞ্চ কাট কালো দাড়ি, চোখে রিমালেস চশমা, পরনে গাঢ় নীল সুটের সঙ্গে জামার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ।

ভদ্রলোক দুজন সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ রবার্টসন? বলতেই পিটার উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। ভদ্রলোক করমর্দন করে বললেন, মই নেম ইজ ন্যাস্কার। আমি

স্টেটসম্যানে তোমার লেখাটা পড়ে খোঁজখবর করে তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে সোজা এখানে চলে আসছি আমার গাড়িতে।

হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

নস্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিটারের মুখোমুখি বসে বলল, আগে তোমার মুখ থেকে আমি একটা কথা শুনতে চাই...

কী?

দেড়শো বছর আগে তোমার পূর্বপুরুষ তাঁর ডায়রিতে যে বাসনার কথা লিখেছেন, তুমি কি সত্যিই সেটা পূরণ করতে এদেশে এসেছ?

অ্যাবসোলিউটলি, বলল। পিটার।

তুমি কি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করা? তোমার কি সত্যিই ধারণা যে রুবিটা ভারতবর্ষে ফেরত দিলে তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে?

পিটার শুকনো গলায় উত্তরটা দিল।

আমি কী বিশ্বাস করি বা না করি সেটা জানার কী দরকার? যতদূর বুঝছি আপনি রুবিটা কেনার প্রস্তাব করছেন। আমার উত্তর হল আমি ওটা বেচব না।

তুমি তোমার দেশের জহুরিকে এটা দেখিয়েছ?

দেখিয়েছি।

রুবির দাম তার মতে কত হতে পারে?

টেগয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস।

পাথরটা কি হাতের কাছে আছে? সেটা একবার দেখতে পারি কি?

পাথরটা টমের কাছেই ছিল; সে ব্যাগ থেকে কৌটোটা বার করে নস্করকে দিল। মিঃ নস্কর কৌটোটা খুলে পাথরটা বার করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারপর পিটারের দিকে ফিরে বলল, তোমাদের দুজনের কাউকেই তো তেমন ধনী বলে মনে হচ্ছে না।

তার কারণ, বলল। পিটার, আমরা ধনী নই। কিন্তু এও বলতে পারি যে আমরা লোভীও নাই।

আমরা দুজনে কিন্তু এক ছাঁচে ঢালা নাই, টম ম্যাক্সওয়েল হঠাৎ বলে উঠল।

তার মানে? নস্কর শুধোলেন।

পিটার বলল, আমার বন্ধু বলতে চাইছে যে এ ব্যাপারে আমাদের দুজনের মধ্যে মতের সম্পূর্ণ মিল নেই। অর্থাৎ, রুবিটা বিক্রি করে দু পয়সা রোজগারের ব্যাপারে তার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু রুবিটা তো ওর প্রপার্টি নয়, আমার প্রপাটি; কাজেই ওর কথায় তেমন আমল না দিলেও চলবে।

টম দেখি। গম্ভীর হয়ে গেছে, তার কপালে গভীর খাঁজ।

এনিওয়ে, বললেন নস্কর, আমি এখানে আরও তিনদিন আছি। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়ি রয়েছে। আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখৰ্ব্ব। অত সহজে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না মিস্টার রবার্টসন। আমি আপনাকে বারো লাখ টাকা দিতে রাজি আছি। আমার মূল্যবান পাথরের সংগ্রহ সারা ভারতবর্ষে পরিচিত। এত বড় একটা রোজগারের সুযোগকে আপনারা কেন হেলাফেলা করছেন জানি না। আশা করি ক্রমে আপনাদের মত পরিবর্তন হবে।

পিটার বলল, এখানে একটা কথা কিন্তু বলা দরকার। আপনার আগে আরেকজন আমাদের অফার দিয়েছেন।

কে?

দুবরাজপুরের একজন ব্যবসায়ী।

ঢানঢানিয়া?

হ্যাঁ।

ও কত দেবে বলেছে?

দশ লাখ। সেটা আরও বাড়বে না। এমন কোনও কথা নেই।

ঠিক আছে। ঢানঢানিয়াকে আমি খুব চিনি; ওকে আমি ম্যানেজ করে নেব।

মিঃ নস্কর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর ওদিকে ডাইনিং রুম থেকে খবর এল যে পাত পড়েছে।

৫. রাধাবিনোদের টেরা কোটা মন্দির

বোলপুর থেকে ২৫ মাইল দূরে আড়াইশো বছর আগে বর্ধমানের এক মহারানির তৈরি রাধাবিনোদের টেরা কোটা মন্দির ঘিরে চলেছে কেন্দুলির বিরাট মেলা। মেলা বলতে যা বোঝায়। তার সবই এখানে আছে। দক্ষিণ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয় নদী।

আমরা আমাদের গাড়িতেই এসেছি। সকলে; সেটা সম্ভব হয়েছে ফেলুদা গাড়ি চালানোর ফলে। আমরা তিনজন সামনে আর পিছনে পিটার, টম ও জগন্নাথ চাটুজ্যে।।

মেলার এক পাশে একটা বিরাট বটগাছের তলায় বাউলরা জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আবার একতারা আর ডুগডুগি নিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে–

আমি অচল পয়সা হলাম রে ভবের বাজারে
তাই ঘৃণা করে ছোঁয় না আমায় রসিক দোকানদারে...

জগন্নাথবাবু এদিকে পিটারকে মন্দিরের গায়ের কারুকার্য বোঝাচ্ছে। আমিও কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক দৃশ্য মন্দিরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে।

টম একটু আগেও আমাদের পাশেই ছিল, এখন জানি না কোথায় চলে গেছে।

একটা সুযোগ পেয়ে ফেলুদা পিটারকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করল, যেটা আমার মাথায়ও ঘুরছিল।

তোমাদের দুজনের বন্ধুত্বে কি একটু চিড় ধরেছে? টমের কথাবার্তা হাবভাবী কাল থেকেই আমার ভাল লাগছে না। তুমি ওর উপর কতখানি বিশ্বাস রাখ?

পিটার বলল, আমরা একই স্কুলে একই কলেজে পড়েছি। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বাইশ বছরের। কিন্তু ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ওকে যেমন দেখছি তেমন আর আগে কখনও দেখিনি। ওর মধ্যে কতকগুলো পরিবর্তন দেখছি; এক এক সময় মনে হয় ওয়া ধারণা ব্রিটিশরা এখনও বুঝি ভারতীয়দের শাসন করে। তা ছাড়া ওদেশে থাকতে রুবিটা ভারতবর্ষে ফেরত দেবার ব্যাপারে ও কোনও আপত্তি করেনি। এখন মনে হচ্ছে, ওটা বিক্রি করতে পারলে ও আরও খুশি হয়।

ওর কি খুব টাকার দরকার?

ও সারা পৃথিবী ঘুরে ছবি তুলতে চায়—বিশেষ করে যেসব দেশে দারিদ্র্যের চেহারাটা খুব প্রকট। এতে যা খরচ হবে সে টাকা ওর কাছে নেই। তবে রুবিটা বিক্রি করলে যা টাকা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের দুজনের খরচ কুলিয়ে যাবে।

ও যদি তোমাকে না জানিয়ে পাথরটা পাচার করে?

সেরকম বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে বলে মনে হয় না। আমি ওকে মাঝে মাঝে শাসন করতে শুরু করেছি। মনে হয় তাতে কাজ দেবে।

ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে বলল, ও কোথায় গেছে বলতে পারো?

তা তো জানি না। আমাকে বলে যায়নি।

আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী?

দক্ষিণ দিকে নদীর পাড় থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে বুঝতে পারছি ওখানে শ্মশান আছে। ও আবার তার ছবি তুলতে যায়নি তো? একবার গিয়ে দেখা দরকার।

লালমোহনবাবু কাছেই একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা তাঁকে ডেকে নিয়ে ধোঁয়ার দিকে রওনা দিলাম।

বাউলের দল পেরিয়ে নদীর পাড়। সেখান থেকে জমিটা ঢালু হয়ে গিয়ে জলে মিশেছে।

ওই যে শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, আরেকটা চিতায় শুইয়ে তার উপর কাঠ চাপানো হচ্ছে।

ওই তো টম। পিটার চেঁচিয়ে উঠল।

আমিও দেখলাম টমকে। সে ক্যামের হাতে যে মড়াটায় কাঠ চাপানো হচ্ছিল তার ছবি তোলার তোড়জোড় করছে।

হি ইজ ডুইং সামথিং ভেরি ফুলিশ, বলল ফেলুদা।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা যে সত্যি সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। মড়ার কাছেই গোটা চারেক মাস্তান টাইপের ছেলে বসেছিল। টম সবে ক্যামেরাটা চোখের সামনে ধরেছে। আর সেই সময় একটা মাস্তান টমের দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটায় মারাল একটা চাপড়, আর যন্ত্রটা টমের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে বালির ওপর পড়ল।

আর টম? সে বিদ্যুদ্বেগে তার ডান হাত দিয়ে মাস্তানের নাকে মারল এক ঘুষি। মাস্তানটা হাত দিয়ে মুখ চেপে মাটিতে বসে পড়ল। হাত সরাতে দেখি ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে মাস্তানদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াল, তার পিছনেই টম।

ফেলুদা এবার মুখ খুলল। যতটা সম্ভব নরম করে সে কথাগুলো বলল।

আপনারা এইবারের মতো এই সাহেবকে মাপ করে দিন। উনি নতুন এসেছেন, কোথায় কী করতে হয় না-হয় সে বিষয়ে এখনও ধারণা নেই। মৃতদেহের ছবি তুলে উনি খুবই

অন্যায় কাজ করেছেন। সেটা আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি। আপনারা এইবারের মতো। ওঁকে মাপ করে দিন।

অবাক হয়ে দেখলাম। একজন মাস্তান এগিয়ে এসে টিপ করে ফেলুদাকে একটা প্রণাম করে বলল, আপনি স্যার ফেলুদা নন? একেবারে সেই মুখ, সেই ফিগার।

হ্যাঁ। আমি স্বীকার করছি আমি ফেলুমিত্তির। এই সাহেব আমাদের বন্ধু। আপনার দয়া করে একে রেহাই দিন।

ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল মাস্তানের দল। আমি বুঝলাম ফেলুদাকে চিনে ফেললে ফল যে সব সময় খারাপ হয় তা মোটেই না।

কিন্তু যে মাস্তান ঘুষি খেয়েছিল সে এ পর্যন্ত কথা বলেনি, এবার বলল– আমি এর বদলা নেব, মনে রেখো সাহেব– চাঁদু মল্লিকের কথা নড়াচড় হয় না।

আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। বালির উপর পড়াতে টমের ক্যামেরার কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে ও দেখলাম বেশ হকচকিয়ে গেছে। আশা করি এবার থেকে ও একটু সাবধান হবে।

আমাদের মেলা দেখার শখ মিটে গিয়েছিল, তাই আমরা বালপুরমুখে রওনা দিলাম।

বোলপুরে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে লাউঞ্জে এসে বসতেই দেখি চৌবে হাজির।

আপনাদের খবর নিতে এলাম, বললেন চৌবে। পুলিশের চোখ, তাই বললেন, দেখে মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা গোলমাল হয়েছে?

বিস্তর গোলমাল, বলল ফেলুদা। তারপর শ্মশানের ঘটনাটা বর্ণনা করে বলল, চাঁদু মল্লিক নামটা কি চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

বিলক্ষণ চেনা, বললেন চৌবে। হেতমপুরে থাকে, নাম-করা গুণ্ডা। বার তিনেক জেলেও গেছে। ও যদি বদলা নেবার কথা বলে থাকে তো সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

ইতিমধ্যে টম ঘরে চলে গিয়েছিল। পিটার বসেছিল আমাদের সঙ্গে। চৌবে ইংব্রিজিতে বললেন, শুধু একটিমাত্র লোক এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি হলেন পিটার রবার্টসন। মিঃ রবার্টসন– প্লিজ কনট্রোল ইওর ফ্রেন্ডস টেমপার। ভারতবর্ষ পঁয়তাল্লিশ বছর হল স্বাধীন হয়েছে। তাদের প্রাক্তন মনিবদের কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আজ আর কোনও ভারতীয় বরদাস্ত করতে পারবে না।

সেটা তুমিই ওকে বলো, বলল। পিটার। আমার মাথায় সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি এই টমকে আর চিনি না। তার সঙ্গে কথা বলতে হয় তুমি বলো। বলে যদি কিছু ফল হয় তা হলে আমাদের এখানে আসাটা সার্থক হবে।

ঠিক আছে। আমিই বলছি। কিন্তু পাথরটা কি আপনার বন্ধুর কাছেই থাকবে? সেটা কি আপনার নিজের জিম্মুম্বায় রাখা চলে না?

আমার অসম্ভব ভুলো মন, জানেন মিঃ চৌবে। পাথরটা মনে হয় ওর কাছেই নিরাপদে আছে। আর ও যদি পাথরটাকে পাচার করতে চায় তা হলে সেটা ও আমাকে না জানিয়ে করবে বলে মনে হয় না।

আমরা উঠে পড়লাম! সবাই মিলে গিয়ে ঢুকলাম দশ নম্বর ঘরে।

একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে টম ম্যাক্সওয়েল, তার ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা আধা-খাওয়া সিগারেট। ঘরের দরজা খোলাই ছিল, আমরা ঢুকতে সে মুখ তুলে চাইল, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। মিঃ চৌবে গিয়ে তার পাশের চেয়ারটায় বসলেন, আমরা বাকি কজন দু খাটে ভাগাভাগি করে বসলাম।

আর ইউ ট্রাইং টুঁ পুট প্রেশাির অন মি? জিজ্ঞেস করল টম ম্যাক্সওয়েল।

নো, বললেন চৌবে, উই হ্যাভ নট কাম টু প্লিড উইথ ইউ। তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে এসেছি।

কী অনুরোধ?

ভারতীয়দের প্রতি তোমার যতই বিদ্বেষ থাক না কেন, সেটা বাইরে প্রকাশ কোরো না।

আমি তো তোমার কথা মতো চলাব না। আমার নিজের বিচারবুদ্ধি যা বলে আমি তাই করব। আমি এই দুই দিনেই দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের দেশ কোথায় পিছিয়ে পড়ে আছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছরে তোমরা এক চুলও অগ্রসর হওনি। এখনও তোমরা হাল বলদ দিয়ে চাষ কর, কলকাতার মতো শহরে মানুষ দিয়ে রিকশা টানাও, ফুটপাথে লোকে শুয়ে থাকে সপরিবারে-এ সব কি সভ্যতার লক্ষণ? তোমরা এ সব গোপন রাখতে চাও বিশ্বের লোকেদের কাছ থেকে। আমি তা মানব না। আমি ছবি তুলে দেখিয়ে দেব স্বাধীন ভারতবর্ষের আসল চেহারা।

শুধু এই কটা দিক দেখলে চলবে না, টম ম্যাক্সওয়েল। অন্য কত দিকে আমাদের দেশ এগিয়েছে সেটা তুমি দেখবে না? আমরা মহাকাশে যান পাঠিয়েছি। আমাদের দেশে দৈনিক ব্যবহারের কতরকম জিনিস তৈরি হয়েছে সেটা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ? জামা-কাপড়, ওষুধপত্র, প্রসাধনের জিনিস, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি-কোনটা না তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষে। শুধু অভাবটাই তুমি দেখবে? তোমাদের দেশে কি নিন্দনীয় কিছু নেই?

দুটোর তুলনা কোরো না। ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা একটা ভাঁওতা। সেটা আমি আমার ক্যামেরা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের উপর যেমন কর্তৃত্ব করে এসেছে, এখনও সেটার দরকার। না হলে এ দেশের কোনও উন্নতি হবে না। মই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ রাইট।

মানে?

তিনি ছিলেন নীল কুঠির মালিক। হি কিক্‌ড ওয়ন অফ হিজসার্ভেন্টস টু ডেথ।

সে কী?

ইয়েস স্যার। হিজ পাংখা-পুলার। এখন তো তবু শীতকাল, গরমে তোমাদের দেশের আবহাওয়া কী বীভৎস হয় তা আমি শুনেছি। সেই গরমকালে রাত্রে আমার পূর্বপুরুষ রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ঘুমোচ্ছিলেন তাঁর বাংলোয়। পাংখাওয়ালা পাংখা টানছিল। টানতে টানতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘাম এবং অজস্র মশার কামড়ের চোটে রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আন্দাজ করেন ব্যাপারটা কী। বাইরে এসে দেখেন। পাংখাপুলার মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। রেজি ন্যান্ড প্রচণ্ড রাগে তার চাকরের পেটে কষে লাথি মারতে থাকেন। তাতে চাকরের ঘুম চিরনিদ্রায় পরিণত হয়। এই হচ্ছে রাইট ট্রিটমেন্ট। তোমরা কী বিশ্রীভাবে মড়া পোড়াও আজ তার ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। এ দৃশ্য আমাদের দেশে কেউ দেখেনি-আমি তাদের দেখাতে চেয়েছিলাম। তবে স্থানীয় কয়েকজন হুডলামস আমাকে শাসাতে আসে। আমি ঘুষি মেরে তাদের একজনের নাক ফাটিয়ে দিই। হি ডিজার্ভড ইট। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আপশোস নেই।

চৌবে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিস্টার ম্যাক্সওয়েল, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে দ্য সুনার ইউ লিভ আওয়ার কান্ট্রি দ্য বেটার। তুমি থাকলে শুধু দেশের অমঙ্গল নয়, তোমার নিজেরও যে অমঙ্গল হতে পারে সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছ।

আমি এ দেশে এসেছি। ছবি তুলতে। সে কাজ শেষ করে তবে আমি ফিরব।

তোমাদের আসার আসল উদ্দেশ্য তো হল রবার্টসনের রুবিটা ফেরত দেওয়া।

সেটা পিটারের উদ্দেশ্য-অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি ইজ বিইং ভেরি স্ট্রপিড়। ও যদি পাথরটা বেচে দেয় তা হলে আমি আরও অনেক বেশি খুশি হব।

৬. ঘরে বসে আড্ডা মারছি

রাত্রে ডিনার সেরে ঘরে বসে আড্ডা মারছি, ফেলুদা সবে একটা চারমিনার ধরিয়েছে, এমন সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

এত তাড়া কীসের? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আরে মশাই, শতদল একটা বই পড়তে দিয়েছে না-সেটা ছাড়তে পারছি না। টম ম্যাক্সওয়েল যে পাংখা-পুলারকে জুতিয়ে মারার গল্প বলল, সেই ঘটনা এই বইতে রয়েছে।

বটে।

বইটার নাম লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম; লিখেছেন এক পাদ্রি, নাম রেভারেন্ড প্রিচার্ড! গত সেঞ্চুরির শেষের দিকের ঘটনা। রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল তার চাকরকে খুন করে। কিন্তু সেই খুনের জন্য কোনও শাস্তি তাকে কোনওদিন ভোগ করতে হয়নি। এই চাকরের নাম ছিল হীরালাল।

মারা যাওয়াতে তার ছেলে অনাথ হয়ে পড়ে। এই পাদ্রি তখন ছিলেন শিউড়িতে। তিনি খুনের খবরটা পেয়ে ম্যাক্সওয়েলের নীলকুঠিতে যান। সেখানে এগারো বছরের অনাথ অনন্ত নারায়ণকে দেখে ভারী দুঃখ পান। তখনই ছেলেটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। তারপর ছেলেটিকে ক্রিশ্চান করে একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করেন। এই পর্যন্ত পড়েছি মশাই। সেই ছেলেটির কী হল জানার জন্য প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে, সে প্লিজ এক্সকিউজ–

দরজায় টাকা। খুলে দেখি পিটার রবার্টসন।

মে আই কাম ইন?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। লালমোহনবাবু আবার বসে পড়লেন। পিটারকে গভীর দেখাচ্ছে; কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

কী ব্যাপার পিটার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আই হ্যাভ ডিসাইডেড টুঁ সেল দ্য রুবি।

সে কী! বসে, বসো–বসে কথা বলে।

পিটার বসল। তারপর বলল, এই দূর দেশে এসে বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা ভেবে মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। টম বদ্ধপরিকর যে পাথরটা বেচে যা টাকা আসবে তাই দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবে। এই ধারণাটা ওকে একেবারে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। আর আমিও ভেবে দেখলাম। – মিউজিয়ামে দিলে কজনে আর পাথরটার কথা জানতে পারবে? তাই অনেক ভেবে-চিন্তে...অবশেষে...

ফেলুদা গম্ভীর। বলল, তোমাদের সিদ্ধান্ত আমি নাকচ করার কে? তবে অনেক আশা করেছিলাম যে তোমার সিদ্ধান্তই কায়েমি থাকবে। এখন দেখছি তা নয়।

লালমোহনবাবু বললেন, কবে বিক্রি করার কথা ভাবিছ তুমি?

প্রথম আফার যখন ঢানঢানিয়ার তখন ওকেই দেব ভাবছি। ওর সঙ্গে টেলিফোনেও কথা হয়ে গেছে। পরশু সকাল দশটায় টাইম দিয়েছে।

একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে বলেছিলে, এখন সেটা একটা মামুলি ঘটনায় পর্যবসিত হল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ফেলুদা।

আই অ্যাম ভেরি সরি।

পিটার চলে গেল। রবার্টসনের রুবির সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারটা জড়িয়ে জিনিসটা কেমন জানি জোলো হয়ে গেল।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে পরদিন সকালে গিয়ে বক্রেশ্বরটা দেখে আসব। ব্রেকফাস্ট খাবার দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ নস্কর তাঁর গাড়িতে এসে টুরিস্ট লজের রিসেপশন বিল্ডিংটার সামনে হাজির হলেন।

গুড মর্নিং।

আমরা লাউঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম, সকলেই গুড মর্নিং বললাম।

হঠাৎ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

একদল জাপানি টুরিস্ট এসেছে। তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি এসেছি আপনাদের আমার ওখানে ইনভাইট করতে। রাত্রে ডিনার। তারপর দশটা নাগাদ দু মাইল দূরে সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে নাচ দেখা। কেমন?

ফেলুদা বলল, ইনভাইট করছেন মানে সবাইকে?

এভরিওয়ান। আপনারা তিনজন এবং সাহেব দুজন।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচা, বলল ফেলুদা। ক'টায় আসব?

এই আটটা নাগাদ। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব কি?

না না, বলল ফেলুদা। আমরা তো ড্রাইভার নিয়ে সবসুদ্ধ ছজন—কোনও অসুবিধা হবে না।

ভেরি ওয়েল। গুড ডে।

বক্রেশ্বর গিয়ে মনে হল সেই কোন আদ্যিকালে এসে পড়েছি। সামনে সারি সারি মন্দির, পিছনে জঙ্গল। তার মধ্যে বটগাছই বেশি। কোনও কোনও বটগাছ থেকে ঝুরি নেমে এসে মন্দিরকে আঁকড়ে ধরেছে। এতগুলো মন্দির আর এতগুলো কুণ্ড, জগন্নাথবাবু দেখলাম সবগুলোর নাম জানেন। লালমোহনবাবু পুজো দিলেন। কারণ বললেন, না দিলে নিজেকে বড় বে-ধর্মিক মনে হচ্ছে। দুজন সাহেবের একজন—পিটার রবার্টসন—সুইমিং ট্রাকস পরে সৌভাগ্য কুণ্ডে সাঁতার কাটল। কুণ্ডের নামের মানেটা আগেই জেনে নিয়েছিল। তাই বলল,দিস উইল ব্রিং মি গুড লাক। মন্দিরের আগেই ভিখিরির দল। তাই টম ম্যাক্সওয়েলের ফোটোজেনিক বিষয়ের অভাব ঘটেনি।

লজে ফিরে আসার আধা ঘণ্টার মধ্যেই ফেলুদার একটা ফোন এল। ইন্সপেক্টর চৌবে। জিজ্ঞেস করল। আমরা সাঁওতাল নাচের খবরটা পেয়েছি কি না! ফেলুদা অবিশ্যি নস্করের বাড়িতে ডিনারের খবরটাও দিয়ে দিল। বলল, সেখান থেকে আমরা নাচ দেখতে যাব। চৌবে বললেন তিনিও সাড়ে দশটা নাগাদ যাবেন, কাজেই ওখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

মিঃ নস্কর ভালরকম ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ওঁর বাড়ি পেতে দেরি হল না। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান, গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকে পোর্টিকের নীচে থামল।

নস্কর আমাদের জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন, আমরা গাড়ি থেকে নামতে আমাদের আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটা সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা কজন বসিলাম! সাহেবদের জন্য ইংরিজিতেই কথাবার্তা হল।

একা মানুষের পক্ষে তো আপনার বিরাট বাড়ি দেখছি, বলল ফেলুদা।

একা বটেই, তবে আমার বন্ধু-বান্ধব অনেক! তাদের চার-পাঁচজনকে ধরে নিয়ে প্রায়ই এখানে ছুটি কাটিয়ে যাই।

নস্কর আর দুই সাহেবের জন্য হুইস্কি এল, আর আমরা ও রসে বঞ্চিত জেনে আমাদের জন্য লিমকা।

লালমোহনবাবুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে হঠাৎ নস্কর বললেন, আপনার বন্ধু যে গোয়েন্দা সে আমি নাম শুনেই বুঝেছি। কিন্তু আপনার সঠিক পরিচয়টা পাওয়া যায়নি। এখন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

উত্তর দিল ফেলুদা।

ওর আসল নামটা অনেকেই জানে না। উনি ছদ্মনামে থ্রিলার লেখেন। সেই নামটা হল। জটায়ু। জনপ্রিয়তায় উনি নাম্বার ওয়ান বললে বেশি বলা হবে না।

ঠিক, ঠিক-আমি পড়েছি আপনার লেখা। সাংঘাইয়ে সংঘাত—কেমন, ঠিক বলিনি?

লালমোহনবাবু একটা বিনয়ী হাসি হাসলেন।

আমি সিরিয়াস বই একদম পড়তে পারি না, বললেন নস্কর। বিলিতি ক্রাইম ফিকশন পড়ি আর মাঝে মাঝে দু-একটা দিশিও চোখে দেখি। এখন কী লিখছেন?

আপাতত রেস্ট। গত পুজোয় একটা বেরিয়েছে। নাম শুনে থাকতে পারেন—- লন্ডনে লণ্ডভণ্ড।

এটাও কি হিট?

সাড়ে চার হাজার কপি নিঃশেষ। -হেঃ হেঃ।

মিঃ নস্কর আসল প্রসঙ্গে যেতে বেশি সময় নিলেন না। পিটারের দিকে ফিরে বললেন, আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কি আপনি কিছু ভেবেছেন?

আমি পাথরটা বিক্রি করে দিচ্ছি। বলাল পিটার।

দ্যাট্স এক্সেলেন্ট।

কিন্তু আপনাকে না।

ঢানঢানিয়া?

হ্যাঁ। উনিই প্রথম আফার দিয়েছিলেন। তাই.... ?

নো, মিঃ রবার্টসন, আপনি ওটা আমাকেই বিক্রি করবেন।

সে কী করে হয়? আই হ্যাভ সেট-আপ মাই মাইন্ড।

কী করে হয় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কারণটা আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মুখ দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। –মিঃ গাঙ্গুলী!

আগ-গেঁ?

ডাকটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর গলা চিরে দু-ভাগ হয়ে গেল।

আপনি কাইন্ডলি যদি এই কাপোটের সামনেটায় এসে দাঁড়ান।

আ-আমি?

আপনিই সবচেয়ে নিরপেক্ষ এবং সবচেয়ে অমায়িক। আপনি ভয় পাবেন না। আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। আমার একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা আপনাদের বলা হয়নি। আমি সকলকে হিপনোটাইজ করতে পারি। সেই অবস্থায় তাদের নানারকম প্রশ্ন করে

সঠিক জবাব পেতে পারি। হিপ্‌নোটাইজড ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলে না। কারণ সেই ক্ষমতাটা তাদের সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে যায়। সেই জায়গায় নতুন ক্ষমতা আসে। সেটার, পরিচয় আপনারা এখনই পাবেন।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে লালমোহনবাবু আপত্তি করার কোনও সুযোগই পেলেন। না! ফেলুদাও দেখলাম নির্বিকার। আসলে লালমোহনবাবুকে নিয়ে কেউ রগড় করলে ও সেটা বেশ উপভোগ করে।

নস্কর উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধ ধরে তাঁকে একরকম টেনে এনেই ঘরের মাঝখানে দাঁড় করালেন। তারপর নিজেই গিয়ে ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাল টর্চ বার করে সেটা জ্বলিয়ে জটায়ুর চোখের উপর ফেলে আলোটাকে ঘোরাতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে তার কথাও শুরু হল।

আপনি সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করুন, আমার উপর নির্ভর করুন। আপনার নিজের সত্তা লোপ পেতে বসেছে, সেই জায়গায় আসছে একটি অলীকিক শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ মানুষ। ...ইয়েস... ইয়েস... ইয়েস... ইয়েস...

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি লালমোহনবাবুর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে, তাঁর মুখ হাঁ হয়ে আসছে। তিনি সটান চেয়ে আছেন নস্করের দিকে।

এবার টর্চ ঘোরানো থামল, কিন্তু নস্কর সেটা লালমোহনবাবুর মুখের উপর ফেলে রাখলেন। তারপর এল প্রথম প্রশ্ন।

আপনার নাম কী?

শ্রী সর্বজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায়, ওরফে লালমোহন, ওরফে জটায়ু।

লালমোহনবাবুর এ নাম আমি কখনও শুনিনি।

এ ঘরে কজন উপস্থিত আছে?

ছয় জন।

তাদের সবাই কি বাঙালি?

দুজন সাহেব।

তাদের নাম কী?

পিটার রবার্টসন। আর টম ম্যাক্সওয়েল।

তাঁরা কোথেকে আসছেন?

ল্যাঙ্কেশিয়ার, ইংল্যান্ড।

এঁদের বয়স কত?

পিটার চৌত্রিশ বছর তিন মাস, টম তেত্রিশ বছর নয় মাস।

এঁদের ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য কী?

পিটারের উদ্দেশ্য রবার্টসনের রুবি দেরত দেওয়া।

সে রুবি কার কাছে আছে?

টিম ম্যাক্সওয়েল।

এই রুবির ভবিষ্যৎ কী?

ওটা বিক্রি হবে।

সেটা কি গণেশ ঢানঢানিয়া কিনবে?

না।

কিন্তু উনি তো দর দিয়েছেন?

এবার দশ লাখ নেমে হবে সাড়ে সাত।

তার মানে পিটার বিক্রি করবে না?

না।

তা হলে?

ওটা অন্য একজন কিনবেন?

কে?

অর্ধেন্দু নস্কর।

কত দাম?

বারো লাখ।

থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

এবার নস্কর লালমোহনবাবুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতেই তিনি ধড়মড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

ওয়েল মিস্টার রবার্টসন?

নস্কর পিটারের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

দ্যাট ওয়জ মোস্ট ইমপ্রেসিভ।

এখন বিশ্বাস হল?

আই ডোন্ট নো হোয়াট টু থিঙ্ক।

তোমাকে ভাবতে হবে না। তাড়া নেই। তুমি ঢানঢানিয়ার সঙ্গে কাল দেখা করো। সাড়ে সাত লাখে তোমার রুবি বিক্রি করতে চাও তো পার। তা না হলে আমার বারো লাখের অফার তো রয়েইছে।

চাকর এসে খবর দিল ডিনার রেডি।

আমরা সকলে উঠে ডাইনিং রুমের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

৭. ঘোড়শোপচারে ডিনার

ঘোড়শোপচারে ডিনার সেরে আমরা সোয়া দশটা নাগাত ফুলবেড়িয়া গ্রামে হাজির হলাম। পূর্ণিমা রাত, তা ছাড়া এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে, তাই দেখার কোনও অসুবিধা নেই। গ্রামের একপাশে একটা মাঠ, সেখানেই লোকের ভিড়। এরা সাঁওতাল নয়–বেশির ভাগই শহরের লোক, নাচ দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দুইই রয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখি ইন্সপেক্টর চৌবে বেরিয়ে এলেন।

শুধু আমি নয়, বললেন চীবে, আপনাদের অনেক পরিচিত ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত।

কী রকম? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

কিশোরীলাল আর চাঁদু মল্লিককেও দেখলাম। সেই বীরভূম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও রয়েছেন।

সে তো ভাল কথা। নাচটা আরম্ভ হবে কখন?

সব লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়েছে তো। যে কোনও মুহূর্তেই শুরু হবে।

পিটারকে দেখে ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বলল, কাছাকাছির মধ্যে থেকে, না হলে ফেরার সময় খুঁজে বার করা মুশকিল হবে।

টম ম্যাক্সওয়েল ক্যামেরা বার করে তাতে ফ্ল্যাশ লাগাচ্ছে। নস্করকে দেখুলাম তিনিও একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাশ ক্যামেরা নিয়ে রেডি। তিনি টমের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। আমি কাছেই ছিলাম, তাই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম। নস্কর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্টুডিয়ো আছে?

না, বলল। টম ম্যাক্সওয়েল। আমি স্টুড়িয়ে ফেটাগ্রাফার নই। আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলি। ফ্রি ল্যান্স। আমার ছবি বহু পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। ভারতবর্ষে যা ছবি তুলিব তা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন নেবে বলেছে। তারাই আমার খরচ বহন করছে।

মাদলে চাঁটি পড়ল। টমের সঙ্গে আমরাও নাচের দলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

নাচ শুরু হয়ে গেছে। জনা তিরিশেক সাজগোজ করা মেয়ে পরস্পরের হাত ধরে দুলতে শুরু করেছে। তিনটে মাদলের সঙ্গে তিনজন বংশীবাদক রয়েছে। মাদল যারা বাজাচ্ছে তাদের পায়ে ঘুঙুর।

লালমোহনবাবু আমার পাশে এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন আবার বাঁ। চোখটা নাচছে। কপালে কী আছে কে জানে।

হিপ্নোটাইজড হয়ে শরীর খারাপ হয়নি তো?

নাঃ। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, জানো ভাই তপেশ। কী যে করেছি। আর কী যে বলেছি তার কিছু মনে নেই।

এবার মশালের আলোয় হঠাৎ চাঁদু মল্লিককে দেখতে পেলাম বিড়ি ফুঁকছে। এক পা এক পা করে সে নাচের দলের দিকে এগোচ্ছে।

না, নাচের দিকে নয়, টমের দিকে।

আমি লালমোহনবাবুকে ফিসফিসিয়ে বললাম, ওকে চোখে চোখে রাখা দরকার।

যা বলেছি।

টম কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সে এবার পিছন দিকে চলে গেল, বোধহয় নতুন দৃষ্টিকোণ খোঁজবার জন্য। সব ফেটাগ্রাফারই কি এই রকম ছটফটে হয়?

চাঁদু মল্লিক একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার দু হাত সরু প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

ক্রমে আমাদের দলের লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। লালমোহনবাবু অবশ্য আমার পাশ ছাড়েননি। আমি বাকি সকলের উপর দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করছিলাম, কারণ ফেরার সময় সকলকে এক জায়গায় জড়ো হতে হবে। ওই যে ফেলুদা, চৌবেকে একটু আগে ওর। পাশে দেখেছিলাম, এখন আর নেই। ওই যে নস্কার-ওঁর ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠিল। অলস ছন্দে নাচ হয়ে চলেছে।

ওই কিশোরীলাল। সে পিটারের দিকে এগোচ্ছে। ওদের মধ্যে কিছু কথা হয় কি না। জানিবার জন্য আমি জটায়ুকে ছেড়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিশোরীলাল পিটারকে সামনে পেয়ে বলল, গুড ইভনিং।

পিটার বলল, কালকে আমাদের অ্যাপিয়েন্টমেন্টটা ঠিক আছে তো?

ইয়েস স্যার।

আশা করি তোমার বাবা মত বদলাবেন না।

নো স্যার। হি হ্যাঁজ মেড আপ হিজ মাইন্ড।

ভেরি গুড।

কিশোরীলাল চলে গেল।

এবার জগন্নাথবাবুকে দেখলাম তাঁর জায়গা নিতে। পিটার হ্যালো বলে বলল, আমাকে এই নাচের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে?

সার্টেন্লি।

জগন্নাথবাবু পিটারের পাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে নাচের ব্যাপারটা. বোঝাতে আরম্ভ করল। আমি আর শুনতে না পেয়ে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

এবার ফেলুদাকে দেখলাম একটা মশালের আলোয়। সে একটা চারমিনার ধরাল।

প্রথম নাচ শেষ হয়ে দ্বিতীয় নাচ শুরু হল। এর তাল একেবারে অন্য, আগেরটার চেয়ে অনেক দ্রুত। মেয়েরা একবার নিচু হচ্ছে পরস্পরের হাত ধরে, তার পরেই সোজা হয়ে উঠছে, তালে তালে, মাদল আর বাঁশির সঙ্গে। সেই সঙ্গে একটানা সুরে গান। ভেরি এক্সাইটিং মন্তব্য করলেন জটায়ু।

আমাদের সামনে দিয়ে মিঃ নস্কর ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আমাদের দিকে একটা প্রশ্ন ছড়ে দিয়ে– কেমন লাগছে?

কী ব্যাপার? এমন জোর নাচ চলেছে আর আপনার কপালে খাঁজ?

প্রশ্নটা জটায়ু করলেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসা ফেলুদাকে।

ভ্রূকুটির কারণ আছে। পরিবেশটা ভাল নয়, ভাল নয়। –ম্যাক্সওয়েলকে দেখেছিস, তোপ্‌সে?

কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি, কিন্তু এখন আর দেখছি না।

ছাকরা গেল কোথায়? বলে আমাদের ছেড়ে ফেলুদা বা দিকে এগিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু বললেন, তোমার দাদাকে হেলপ করবে? চলো আমরাও গিয়ে দেখি ম্যাক্সওয়েল গেল কোথায়।

চলুন।

লালমোহনবাবুর হাত ধরে এগিয়ে গেলাম নাচের দলের পিছন দিকটায়। চাঁদু মল্লিক। কিশোরীলাল। এক ঝলক এক ঝলক দেখছি। একেকটা চেনা মুখ। কিন্তু টম কই?

ওই যে পিটার। সেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে এদিক ওদিক দেখছে।

হ্যাভ ইউ সিন টম?

আমরাও ওকেই খুঁজছি।

আই ভেন্ট লাইক দিস অ্যাট অল।

পিটার টমকে খুঁজতে ডাইনে চলে গেল। আমরা বাঁয়ে এগিয়ে গেলাম। নাচ এখন আরও দ্রুত, মাদল বেজে চলেছে। নীচের দল গাইছে, দুলছে আর ঘুরছে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে ফেলুদা বেরিয়ে এল।

চৌবেকে দেখেছিস?

সে গম্ভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে এগিয়ে গেল। দুবার তাকে গলা তুলতে শুনলাম।

ইন্সপেক্টর চৌবে! ইন্সপেক্টর চৌবে।

এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদাকে আবার দেখলাম, সঙ্গে চোবে। তারা দ্রুত এগিয়ে গেল ডান দিকে।

কী ব্যাপার? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে ম্যাক্সওয়েল বলে ফেলুদা আর চৌবে এগিয়ে গেল।

এবার আমরা ফেলুদা আর চীবেকে অনুসরণ করে দৌড় শুরু করলাম।

একটা গাছের ধরে গিয়ে ফেলুদা থামল। হাত দশেক দূরে একটা মশাল জ্বলছে। তাঁর আলোয় দেখলাম ম্যাক্সওয়েল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে ঘাসের উপর লুটাচ্ছে তার ব্যাগ আর ফ্ল্যাশাসমেত ক্যামেরা।

ইজ হি ডেড? চৌবের প্রশ্ন।

না। অজ্ঞান। পালস আছে।

চৌবের কাছে দেখলাম একটা ছোট্ট টর্চ রয়েছে। সেটা জ্বলিয়ে টমের মুখের উপর ফেলতে টমের চোখের পাতাটা যেন নড়ে উঠল। ফেলুদা এবারটমের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

ম্যাক্সওয়েল। টম!

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে মশালের আলোয় ছুটে বেরিয়ে এল পিটার।

হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ হিমা? ইজ হি ডেড?

না। অজ্ঞান, বললেন চৌবে। তবে জ্ঞান ফিরছে।

ইতিমধ্যে টম চোখ খুলেছে। তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত।

কোথায় লেগেছে তোমার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

টম কোনওরকমে হাত দিয়ে মাথার পিছনটা দেখিয়ে দিল।

এবার পিটার মাটি থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা খুলে ভিতরে হাত ঢোকাতে তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

দ্য রুবি ইজ গান, ভারী গলায় বলল পিটার।

টমকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা আবার নস্করের বাড়িতে ফিরে এলাম। রুবি উধাও শুনে নস্করের অবস্থা দেখবার মতো হয়েছিল। সে শ্লেষ মেশানো গলায় বলল, তোমরা যা চেয়েছিলে তাই হল। ভারতবর্ষের রুবি ভারতবর্ষেই ফিরে এল, তবে তোমাদের পৃথিবী ভ্রমণ আমার হল না।

পূর্বপল্লীর ডাক্তার সিংহ টমকে পরীক্ষা করে বললেন, মাথার পিছনের একটা অংশ ফুলেছে। কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করার ফলে টম সংজ্ঞা হারায়।

এই আঘাত থেকে মৃত্যু হতে পারত কি? পিটার জিজ্ঞেস করল।

আরেকটু জোরে হলে হতে পারত বইকী? বললেন ডাঃ সিংহ। আপাতত ওখানটায় বরফ ঘষে দেওয়া ছাড়া আর কোনও চিকিৎসা নেই। ব্যথা বেশি হলে একটা পেন। কিলার খেয়ে নিলে কাজ দেবে।

ডাঃ সিংহ চলে যাবার পর চৌবে মুখ খুললেন।

মিঃ ম্যাক্সওয়েল, আপনাকে যে আঘাত করেছে তাকে তো আপনি দেখতে পাননি বলে বললেন।

না। সে লোক আমার পিছন দিক দিয়ে আসে।

যতদূর বুঝতে পারছি, বললেন চৌবে, মাথার পিছনে বাড়ি মারার কারণ ওই পাথর চুরি করা। টম ম্যাক্সওয়েলের ব্যাগে এরকম একটা পাথর ছিল সেটা অনেকেই জানত না, যদিও রবার্টসনস রুবির কথা অনেকেই এর মধ্যে জেনে গেছে। যাঁরা টমের ব্যাগে পাথর আছে জানতেন তাঁরা হলেন আমি, মিস্টার মিত্তির, তাঁর ভাই, তাঁর বন্ধু লালমোহনবাবু, জগন্নাথ চাটুজ্যে, কিশোরীলাল এবং মিঃ নস্কর।

মিঃ নস্কর হা হাঁ করে উঠলেন। –পাথরটা তো আমার হাতে চলেই আসত; সেখানে আমি এ রাস্তা নেব কেন-যেখানে আমার বাড়ি খেয়ে টম খুনিও হয়ে যেতে পারত?

ও সব বলে লাভ নেই, মিঃ নস্কর। আপনি প্রাইম সাসপেক্ট। হিপূনোিটাইজড অবস্থায় মিঃ গাঙ্গুলী যা বলেছেন সেগুলো যে ফলবেই এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। এ রুবি যেমন তেমন রুবি নয়, আর আপনিও যেমন তেমন কালেক্টর নন। সে রুবি বৃহীত হয়ে যেতে পারে জেনে আপনি সেটা বিনা পয়সায় হাত করার চেষ্টা করবেন না? কী বলছেন। আপনি?

ননসেন্স! ননসেন্স! বলে নস্কর চুপ করে গেলেন।

চৌবে বলে চললেন, এ ছাড়া আছে কিশোরীলাল। তার বাপ পয়সা দিয়ে জিনিসটা কিনতে চেয়েছিলেন। তাতে ছেলের কোনও লাভ হত না। অথচ ছেলে রুবির মূল্য জানে, সেটা কোথায় থাকে তা জানে। এই অবস্থায় সেটাকে হাতাবার চেষ্টা করাটা কি খুব অস্বাভাবিক?..টমের উপর আক্রোশ ছিল এমন এক ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। সে হল চাঁদু মল্লিক। মাথায় বাড়ি মারাটা চাঁদুর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ সে বদলা নেবে। বলে শাসিয়েই রেখেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে কি রুবিয়া ব্যাপারটা জানত? মনে তো হয় না। এখানে টমকে মাথায় আঘাত মেরে অজ্ঞান করে স্রেফ টাকাকড়ির লোভে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে যদি ঘটনাচক্রে রুবির কৌটোটা পেয়ে যায়—এই সম্ভাবনাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না, পারি কি?... আরেকজন সাসপেক্ট হচ্ছে জগন্নাথ চাটুজ্যে। ইনি রুবি সম্বন্ধে জানতেন, কোথায় সেটা থাকে তাও জানতেন। ওঁর এ হেন আচরণের কারণ একমাত্র লোভ।

ফেলুদা বলল, একজন সাসপেক্টকে আপনি বাদ দিয়ে যাচ্ছেন, মিঃ চৌবে।

কে?

পিটার রবার্টসন।

হোয়াট! বলে লাফিয়ে উঠল। পিটার।

ইয়েস মিঃ রবার্টসন! বলল ফেলুদা। তুমি চেয়েছিলে রুবিটকে কলকাতার মিউজিয়ামের হাতে তুলে দিতে। তোমার বন্ধু তাতে বাদ সাধছিল। পাছে বিদেশে এসে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় তাই তুমি পাথরটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলে। কিন্তু শেষে তোমার মত পালটানো আশ্চর্য নয়। এমনিতেও টমের সঙ্গে তোমার আর সীহাদ্যের সম্পর্ক ছিল না। আমি যদি বলি যে তুমি তোমার মূল সিদ্ধান্তে ফিরে গিয়েছিলে, এবং তাই পাথরটা নিজের কাছে নিয়ে আস।

কথাগুলো শুনে রবার্টসন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সটান উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো মাথায় তুলে বলল, আমি নিয়েছি কি না জানার খুব সহজ। রাস্ত আছে। সার্চ মি, ইন্সপেক্টর চৌবে। রুবি নিয়ে থাকলে এর মধ্যে সেটা সরাবার কোনও সুযোগ আমি পাইনি। কাম অন, ইন্সপেক্টর-সার্চ মি।

ভেরি ওয়েল, বলে ইন্সপেক্টর চৌবে উঠে গিয়ে পিটারকে সার্চ করলেন। কিছুই পাওয়া গেল না।

এবার ফেলুদা বলল, ওঁকে যখন সার্চ করা হল তখন আমরা তিনজন বাদ যাই কেন? আসুন মিঃ চৌবে।

চৌবে ইতস্তত ভাব করছেন দেখে ফেলুদা আবার বলল, আসুন আসুন, মনের মধ্যে সন্দেহ রাখা ভাল না।

চৌবে আমাদের তিন জনকেই সার্চ করলেন। তারপর বললেন, মিঃ রবার্টসন, এ ব্যাপারে। আমি তদন্ত করি এটা আপনি চান কি?

নিশ্চয়ই, জোরের সঙ্গে বলল রবার্টসন। আই ওয়ন্ট দ্যাট রুবি ব্যাক অ্যাট এনি কস্ট।

৮. ব্যথাটা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি

পরদিন সকালে টমকে দেখলাম সে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বলল ব্যথাটা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। কিন্তু আর দুদিনের মধ্যেই চলে যাবে।

পাথর চুরির ব্যাপারটায় দুই বন্ধুই দেখলাম সমান কাতর। এই ভাবে পাথরটাকে ভারতবর্ষে রেখে যাবার কথাটা পিটার মোটেই ভাবেনি, আর টম আপশোস করছে। প্রথম দিনই কেন সেটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়নি, যখন ঢানঢানিয়াও এত ভাল অফার দিল।

মিস্টার চৌবে সকালে আমাদের ঘরে এলেন এগারোটা নাগাত। বললেন এসে প্রথমে একবার টমকে দেখেছেন, তারপর আমাদের কাছে এসেছেন রিপোর্ট নিতে।

কিছু এগোল? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

একজন সাসপেক্টকে বাদ দিতে হয়েছে।

কে?

কিশোরীলাল।

কেন? বাদ কেন?

প্রথমত, আমি যতদূর জানি কিশোরীলালকে, সে অত বেপরোয়া নয়। তা ছাড়া–এটা আমি জানতাম না- মাস খানেক হল ঢানঢানিয়া বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে তার ছেলেকে একটা প্ল্যাস্টিকের ফ্যাক্টরি বানিয়ে দিয়েছে। কিশোরী রেগুলার কাজে যাতায়াত করছে। তার বাবা কড়া নজর রেখেছেন তার উপর। এই সময় একটা পাথর চুরি করে বিক্রি করে হাতে কাঁচা টাকা পেলে সেটা বাবার দৃষ্টি এড়াত না। সো–কিশোরীলাল ইজ আউট।

চাঁদু মল্লিক?

আমাদের যা হিসেব, তাতে টম মাথায় আঘাত পায় পীনে এগারোটা নাগাত। তখন চাঁদু বালপুরে নবীন ঘোষের মদের দাকানে। একাধিক সাক্ষী আছে। তাদের সবাইকে জেরা করে দেখেছি। চাঁদু ইজ আউট টু।

বাকি দুজন?

আজ সকালে নস্করের বাড়ি সার্চ করেছিলাম। পাথরটা পাওয়া যায়নি। অবিশ্যি তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। এতটুকু পাথর লুকিয়ে রাখা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ পড়ছে কিন্তু বীরভূম এক্সপার্ট জগন্নাথ চ্যাটার্জির ওপর।

এটা কেন বলছেন?

ও বীরভূম এসেছে মাত্র তিন বছর হল। ওর বাড়িতে একটা টুরিস্ট গাইড আছে, সেটার নাম হল ভ্রমণসঙ্গী। তা থেকেই ও তথ্য সংগ্রহ করে। বালপুরের আগে বর্ধমানে ছিল। সেখানে তার পুলিশ রেকর্ড রয়েছে—জালিয়াতির কেস।

তাই বুঝি?

ইয়েস স্যার। আমার মতে হি ইজ আওয়ার ম্যান। সাহেবদের কাছ থেকেও ও পারিশ্রমিক আদায় করছিল। ওয়ান হান্ড্রেড রুপিজ পার ডে। সমস্ত ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক।

ওর বাড়ি সার্চ করেছেন?

করব আজি দুপুরে। শুধু সার্চ না-কারণ সার্চ করে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না-কড়া কথা বলে ওর মনে চরম ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভাল কথা-আপনি নিজে কোনও তদন্ত করবেন না?

বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি অনেক বেশি কার্যকরী হবেন বলে মনে হয়। তবে মাথা খেলবে। ঠিকই, আর কিছু মনে এলে আপনাকে জানাব। ইয়ে–আমি যে সাসপেক্টটার কথা বলেছিলাম তার কী হল?

পিটার রবার্টসন?

হ্যাঁ, কারণ আমার ধারণা ওর এখন যে মনের অবস্থা তাতে ও বন্ধুবিচ্ছেদটা মেনে নিতে প্রস্তুত। প্যাট্রিক রবার্টসনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাটাও ওর এখন প্রধান লক্ষ্য।

আপনার কথা মনে রেখেই আমি একটু আগেই ওর ঘরটা ভাল করে। সার্চ করেছি। কিছু পাইনি।

চৌবে চা আর বিস্কুট খেয়ে উঠে পড়লেন; বললেন ওবেলা আবার আসবেন।

ফেলুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড় গোলমেলে ব্যাপার। পাঁচটা সাসপেক্ট পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এখানে শখের গোয়েন্দাকে পুলিশ টেক্কা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কী?

আপনার কি কারুর উপর সন্দেহ পড়ল? জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

এই পাঁচজনের মধ্যে?

হ্যাঁ।

কিশোরীলালের ব্যবসার ব্যাপারটা যদিও জানতাম না, কিন্তু তাও আমার মন ওকে বাতিল করে দিচ্ছিল। তার কারণ ছেলেটার মধ্যে হিম্মতের অভাব। কাউকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করার সামর্থ্য ওর আছে বলে মনে হয় না, আর তার উপর ওই ভিড়ের মধ্যে ব্যাগ খুলে তার থেকে পাথর বার করে নিয়ে পালানো...

চাঁদু মল্লিক?

ওর সামর্থ আছে সন্দেহ নেই, তবে রুবি সম্বন্ধে-বিশেষ করে টমের ব্যাগে রুবি আছে সেটা ওর পক্ষে জানা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। নস্কর লোকটাকেও সন্দেহ করতে আমার মন চায় না। বিশেষ করে মাথায় বাড়িটাড়ি মারার ব্যাপারে ও মোটেই নিজেকে জড়াবে না। তা ছাড়া এটা মনে রাখতে হবে লোকটার টাকার অভাব একেবারেই নেই।

একটা জিনিস। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

কী

হিপ্‌নোটাইজ হয়ে মানুষ সত্যি কথা বলে?

কোন সত্যিটা বলছেন আপনি?

বাঃ, তপেশা যে বললে ওদের বয়স বলে দিলুম। ওরা ল্যাঙ্কেশিয়ার থেকে এসেছে বলে দিলুম।

দুটো তথ্যই স্টেটসম্যানের লেখার গোড়ার দিকেই ছিল।

তই বুঝি?

ইয়েস স্যার। আর বাকি যা বলেছেন সেটা যে মিথ্যে সে তো প্রমাণই হয়ে গেল।

তা বটে। ... তা হলে জগন্নাথ চ্যাটার্জিই কালপ্রিট?

চৌবে যা বলল, তাতে তো সেরকমই মনে হচ্ছে। মামলাটার পরিসমাপ্তি খুব জমাটি হল না সেটা–

ফেলুদার কথা শেষ হল না। কারণ দরজায় টাকা পড়েছে।

খুলে দেখি টম ম্যাক্সওয়েল-তর মুখ গম্ভীর। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল টমের দিকে! টম মাথা নাড়ল।

আমি বসতে আসিনি।

আই সি।

আমি এসেছি তুমি এবং তোমার দুই বন্ধুর ঘর সার্চ করতে।

সার্চ তো কাল একবার করা হয়ে গেছে। তাতে তোমার বিশ্বাস হল না!

নো। সে সার্চ করেছে ইন্ডিয়ান পুলিশ। আমার তাদের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই।

সার্চ করতে ওয়ারেন্ট লাগে তা জানো? যে কেউ সার্চ করতে চাইলেই সার্চ করতে পারে না।

তা হলে তুমি আমাকে সার্চ করতে দেবে না?

নো, মিঃ ম্যাক্সওয়েল। ও ব্যাপারটা কালই হয়ে গেছে। আজ আর হবে না।

ম্যাক্সওয়েল আর দ্বিরুক্তি না করে অ্যাবাউট টার্ন করে চলে গেল।

বোঝে, বললেন লালমোহনবাবু। আপনার সঙ্গে অনেক তদন্তেই অংশগ্রহণ করলুম, কিন্তু ক্রিমিন্যাল বলে সাসপিশন এই প্রথম পড়ল আমাদের উপর।

সব রকম অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকা ভাল, তাই নয় কি?

তা বটে। তা আপনি কি স্রেফ ঘরে বসে তদন্ত করবেন। বেরোবেন না কোথাও?

দরকার হলে নিশ্চয়ই বেরোব। তবে এখনকার স্টেজটা হল চিন্তা করার স্টেজ, আর সেটা ঘরে বসেই সবচেয়ে ভাল হয়। অবিশ্যি তাই বলে আপনাদের ধরে রাখতে চাই না।

আপনার স্বচ্ছন্দে বেরোতে পারেন। শান্তিনিকেতন এবং তার আশেপাশে এখনও অনেক কিছুই দেখতে বাকি আছে।

ভেরি ওয়েল। আমরা তা হলে একবার শতদলকে গিয়ে ধরি; ও বলছিল ওর আজ কোনও ক্লাস নেই। দেখি ও কী সাজেস্ট করে। আপনাকে বরং একটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। – শতদলের দেওয়া সেই বই। সেই পাদ্রি প্রিচার্ডের লেখা। দারুণ বই মশাই। কাল রাত্তিরে শেষ করেচি। এই ম্যাক্সওয়েলের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাবেন। আর নীল চাষ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে।

ফেলুদাকে বইটা দিয়ে আমি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লাম।

শতদলবাবু বললেন, চলো তোমাদের একটা খাঁটি গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আসি। গোয়ালপাড়া। আর তার পিছনেই আছে গুরুদেবের প্রিয় নদী কোপাই। এ দুটো না দেখলে শান্তিনিকেতন দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গ্রাম এর আগে যে দেখিনি তা নয়, তবে গোয়ালপাড়ার মতো খাঁটি গ্রামের চেহারা এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে। তাঁর প্রিয় কবি বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা কবিতার খানিকটা অংশ আবৃত্তি করে ফেললেন–

বাংলার গ্রামে স্পন্দিছে মোর প্রাণ
সেই কবে দেখা-আজও স্মৃতি অম্লান
যেদিকে ফেরাও দৃষ্টি
মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলে দেখা কী অপরূপ সৃষ্টি!

কোপাই দেখেও সেই একই ব্যাপার। এটাতে বোঝা যায় যে বৈকুণ্ঠ মল্লিক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন–

জীর্ণ কোপাই সর্পিল গতি

মন বলে দেখে–~মনোরম অতি
দুই পাশে ধান
প্রকৃতির দান
দুলে ওঠে সমীরণে,
বলে দেবে কবি
আঁকা রূবে ছবি
চিরতরে মোর মনে।

৯. এক আশ্চর্য ঘটনা

বিকালে এক আশ্চর্য ঘটনা। ইনস্পেক্টর চৌবে পাঁচটা নাগাত এসে বললেন, কেস খতম্। যা ভেবেছিলাম। তাই। জগন্নাথ চাটুজ্যে নিয়েছিল পাথরটা। সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়নি। অবশ্য, কিন্তু তারপর একটু পুলিশি চাপ দেওয়াতে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ে—আর সেই সঙ্গে পাথরটাও। একটা ফুলের টবে পুঁতে রেখেছিল।

আপনি নিয়ে এসেছেন পাথরটা?

ন্যাচারেলি।

চৌবে পকেট থেকে পাথরটা বার করলেন। আবার নতুন করে সেটার ঝলমলে রং দেখে মনটা কেমন জানি হয়ে গেল।

আশ্চর্য! বলল ফেলুদা।

কেন?

লোকটাকে দেখে চোর বলে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু জখমকারী বলে যায় না। একেবারে ভেতো বাঙালি।

মানুষের চেহারা দেখে সব সময় তার ভেতরটা জাজ করা যায় না মিঃ মিত্তির।

সেটা অবশ্য আমার অভিজ্ঞতাই বলে।

তা হলে পাথরটাকে এবার স্বস্থানে চালান দিই?

চলুন।

আমরা চারজনে দশ নম্বর ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

পিটার দরজা খুলল।

ওয়েল, মিঃ রবার্টসন, বললেন চৌবে, আই হ্যাভ এ লিট্‌ল গিফ্‌ট ফর ইউ।

হোয়াট?

চৌবে পকেট থেকে কৌটোটা বার করে পিটারের হাতে দিলেন।

পিটার ও টমের মুখ হাঁ।

বাট, হোয়্যার-হোয়্যার...?

সেটা না হয় আর নাই বললাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে সেটাই হল আসল কথা। মিঃ ম্যাক্সওয়েল নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভারতীয় পুলিশ বেশ করিৎকম। এবার অবিশ্যি তোমরা এটা নিয়ে কী করবে। দ্যাট ইজ আপ টুঁ ইউ। বিক্রি করতে পার, ক্যালকাটা মিউজিয়ামেও দিয়ে দিতে পার।

পিটার ও টম দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, দুজনেই এবার ধাপ করে খাটে বসে পড়ল। পিটার মৃদুস্বরে বলল, গুড শো। কনগ্র্যাচুলেশনস।

এবার তা হলে চলি? বললেন চৌবে।

আই ডোন্ট নো হাউ টুঁ থ্যাঙ্ক ইউ। বলল। টম ম্যাক্সওয়েল।

ডোনট্‌। তোমার মনে যে ধন্যবাদ দেবার প্রশ্নটা জেগেছে সেটাই বড় কথা। আমরা তাতেই খুশি।

কী মনে হচ্ছে মশাই? পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

কোথায় যেন গণ্ডগোল, বিড়বিড় করে বলল ফেলুদা।

আমি বলব কোথায় গণ্ডগোল? এই ফর দ্য ফাস্ট টাইম দারোগার কাছে হেরে গেলেন। ফেলুমিত্তির। সেইখানেই গণ্ডগোল।

উঁহু। তা নয়। মুশকিল হচ্ছে কী আমি বিশ্বাস করছি না। আমি হেরে গেছি।

ফেলুদা চুপ করে গেল। তারপর বলল, তোপ্‌সে-তুই এখন কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর ঘরে যা। আমি একটু একা থাকতে চাই।

লালমোহনবাবুর ঘরে গিয়ে বসতে ভদ্রলোক বললেন, আমার ভাল লাগছে না ভাই তপেশ। একটা সুযোগ এসেও কেমন যেন ফসকে গেল। তাই বোধহয় কাল বা চোখটা নাচছিল।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার দাদার শরীর-স্ত্ররীর খারাপ হয়নি তো? দেখে কেন জানি মনে হচ্ছিল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।

ঘুম হয়েছে, তবে অনেক রাত অবধি আপনার দেওয়া বইটা পড়েছে এটা আমি জানি। অবিশ্যি তাও সেই সকল সাড়ে পাঁচটায় উঠে যোগব্যায়াম করেছে।

তোপ্‌সে!

ফেলুদার গলা, সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। দরজা খুললাম।

ফেলুদা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বলল, চলুন। –বেরোতে হবে। চৌবের ওখানে। দেরি নয়–ইমিডিয়েটলি।

আমরা তৈরিই ছিলাম, তিনজন বেবিয়ে পড়লাম।

দুবরাজপুর থানায় গিয়ে গাড়িটা থামল। আমরা তিনজন নামলাম। একজন কনস্টেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এল।

একটু ইনস্পেক্টর চৌবের সঙ্গে দেখা করব।

আসুন।

আমরা চৌবের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক কাগজপত্র দেখছিলেন, আমাদের দেখে অবাক আর খুশি মেশানো দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

কী ব্যাপার?

একটু কথা ছিল।

বসুন, বসুন।

আমরা তিনজন চৌবের টেবিলের উলটোদিকে তিনটে চেয়ারে বসলাম।

চা খাবেন তো?

নো থ্যাঙ্কস। একটু আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়েছি।

তা বলুন কী ব্যাপার।

মাত্র একটা প্রশ্ন।

বলুন, বলুন।

আপনি কি ক্রিশ্চান?

চৌবের চোখ কপালে উঠে গেল। তারপর একটা সরল হাসি হেসে বললেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আমি জানতে চাই। প্লিজ বলুন।

ইয়েস, আই অ্যাম এ ক্রিশচীন-কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

আপনাকে আমি চারবার খেতে দেখেছি। প্রথমবার ঢানঢানিয়ার বাড়িতে লাড্ডু আর সরবত। লাড্ডু আপনি বা হাতে খান। ব্যাপারটা দেখেছিলাম বটে, কিন্তু যাকে লক্ষ করা বলে তা করিনি। অর্থাৎ ওটার তাৎপর্য বুঝিনি। দ্বিতীয়বার, চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে নানখাটাই খেলেন, তাও বাঁ হাতে। এটা আমার মনের কোণে নোট করে রেখেছিলাম। কাল চা বিস্কুট খেলেন আমাদের ঘরে, বিস্কুট বা হাতে। তখনই বুঝতে পারি আপনি ক্রিশ্চান। কিন্তু এবারও তাৎপর্য বুঝিনি। এখন বুঝেছি।

বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু তাৎপর্যটা কী সেটা জানতে পারি? এই কথাটা বলতে আপনি একেবারে দুবরাজপুর চলে এলেন?

তা হলে আরেকটা প্রশ্ন করি?

করুন।

আপনার ফ্যামিলিতে প্রথম কে ক্রিশচীন হয়?

তাঁর নাম?

অনন্ত নারায়ণ।

তাঁর ছেলের নাম?

চার্লস প্রেমচাঁদ।

অ্যান্ড হিজ সন?

রিচার্ড শঙ্কর প্রসাদ।

তিনি কি আপনি?

ইয়েস স্যার।

আপনার ঠাকুরদাদার বাবার নাম কি হীরালাল?

হ্যাঁ-বাটি হাউ ডিড ইউ–?

চৌবের মুখ থেকে খুশি ভাৰটা চলে গিয়ে এখন খালি অবাক অবিশ্বাস।

এই হীরালালই কি রেজিমন্যান্ড ম্যাক্সওয়েলের পাংখা টানত?

এ খবর আপনি পেলেন কী করে?

একটা বই থেকে। পাদ্রি প্রিচার্ডের লেখা! যিনি আপনার ঠাকুরদাদাকে অনাথ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে ক্রিশচন করে তার ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

এরকম একটা বই আছে বুঝি?

আছে। দুষ্প্রাপ্য বই, কিন্তু আছে।

তা হলে তো আপনি–

কী?

আপনি তো জানেন...

কী জানি?

সেটা আপনিই বলুন মিঃ মিত্তির। আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে।

বলছি, বলল ফেলুদা। আপনার প্রপিতামহর সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে প্রাণত্যাগ করার ঘটনা। আপনি এখনও ভুলতে পারেননি। ছেলেবেলা থেকেই হয়তো শুনে এসেছেন রেজিন্যাল্ড খ্যাঁকশেয়াল কী জাতীয় লোক ছিলেন। যখন আপনি জানলেন যে সেই রেজিন্যাল্ডের নাতি এখানে এসেছে এবং যখন দেখলেন সেই নাতির মধ্যে রেজিন্যাল্ডের ঔদ্ধত্য। আর ভারতবিদ্বেষ পুরোপুরি বর্তমান, তখন–

ঠিক আছে, মিঃ মিত্তির, আর বলতে হবে না।

তা হলে আমি যা ভাবছি সেটাই ঠিক তো?

কী?

আপনি প্রতিহিংসাবশত টমকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেন। পাথরটা নেন যাতে

সন্দেহটা ওই চারজনের উপর গিয়ে পড়ে।

ঠিক। এখন এর জন্য আমার কী শাস্তি হওয়া উচিত বলুন।

সেটাই আমি আপনাকে বলতে এসেছি।

কী?

আপনার কোনও শাস্তি হবে না। আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও ঠিক এই জিনিসই

করতাম। আপনি গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছেন। আপনি নির্দোষ।

থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ মিত্তির-থ্যাঙ্ক ইউ।

এখন আপনার কোন চোখ নাচছে, মিঃ সর্বজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায়?

দুচোখই। একসঙ্গে। আনন্দের নাচনি। আমি কেবল ভাবছি। একটা কথা।

আমি জানি।

কী বলুন তো?

আপনার বন্ধু শতদল সেনকে ধন্যবাদ দিতে হবে, এই তো?

মোক্ষম ধরেছেন। তিনি বইটা না দিলে—

–এই মামলার নিস্পত্তি হত না-

আর জগন্নাথ চাটুজ্যে রয়ে যেতেন ক্রিমিনাল।

অন্তত আমাদের মনে।

ঠিক বলেছেন।

হরিপদবাবু-চলুন তো দেখি পিয়ার্সন পল্লী। শতদল সেনের বাড়ি।

*

রবার্টসনের রুবিটা শেষ পর্যন্ত মিউজিয়মেই গেল। কৃতিত্বটা যে ফেলুদার, সেটা বলাই বাহুল্য। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা যখন ম্যাক্সওয়েলের ভারতবর্ষে আসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ও যথেষ্ট নাম-করা ফোটোগ্রাফার, এবং এই জাতীয় লোকের টাকার অভাব থাকার কথা নয়। আরও টাকার লোভে ও রুবিটা বিক্রি করতে চাইছিল। পিটার ম্যাক্সওয়েলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলেও ছাটবেলাকার বন্ধুত্বের কথা ভেবে ওর কথায় সরল বিশ্বাসে রুবিটা বিক্রি

করতে রাজি হয়েছিলেন। ফেলুদার কথায় তিনি পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য যা করতে এসেছিলেন তাই করলেন। ম্যাক্সওয়েলের রাগ ও আস্ফালন কোনও কিছুই তাঁকে টলাতে পারল না।